বনফুলের আরও গল্প

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)

আই. এ. পি. কোং লিঃ
৮-সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক ঃ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

তৃতীয় সংস্করণ
১৯৪৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী লীলাবতী দেবী

করকমলেষু—

১৩-৮-৩৮
ভাগলপুর।

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

শুনিতে পাই গ্রন্থের বাজারে ছোট-গল্পের চাহিদা নাই। এই প্রবল জনশ্রুতি সত্ত্বেও আমার ছোট গল্পগুলি পুনরায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেছি; তাহার কারণ গ্রন্থকার হইবার বাসনা প্রবলতর। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই সুতরাং আমি এমন একদল পাঠকপাঠিকার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আশান্বিত হইতেছি যাঁহারা গল্পের রসাস্বাদনের জন্য ফুট, ইঞ্চি, সের, ছটাক জাতীয় মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল নহেন।

সব কল্পনা অলীক নহে ইহাই ভরসা।

১১-৮-৩৮
ভাগলপুর

"বনফুল"

দ্বিতীয় সংস্করণের

নিবেদন

ছয় বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। ইহার জন্য লেখক, পাঠক, প্রকাশক কে দায়ী জানি না। তথাপি দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে তো! কল্পনা সুতরাং অলীক নহে।

৯-৫-৪৫
ভাগলপুর

"বনফুল"

সূচীপত্র

রূপকথা ১
ঐরাবত ২
উৎসবের ইতিহাস ১৪
অলকনন্দা ১৯
যুগান্তর ৩৫
বাস্তব ও স্বপ্ন ৪৪
খড়মের দৌরাত্ম্য ৫৫
পাশাপাশি ৫৯
বিদ্যাসাগর ৬৫
পাঠকের মৃত্যু ৬৯
দত্ত মহাশয় ৭৩
মিষ্টার মুখার্জ্জি ৮২
খুড়ো ৮৭
অক্ষমের আত্মকথা ৯১
ক্যান্‌ভাসার ৯৪
বৈষ্ণব-শাক্ত ৯৮
অন্তর্য্যামীর কাণ্ড ১০১
স্ত্রীচরিত্র ১০৪

থিয়োরি অব্ রিলেটিভিটি … … ১০৯
মুহূর্ত্তের মহিমা … … … ১১৮
শ্রীপতি সামন্ত … … … ১২৪
শরশয্যা … … … ১৩১
ভ্রষ্টলগ্ন … … … ১৩৬
ঘটনাচক্র … … … ১৪৪
কালো .. … … ১৫২
বংশগৌরব … … … ১৫৮
ভূত … … … ১৬৪
জগমোহন … … … ১৬৯
চৌধুরী … … … ১৭৫
ভোম্বলদা … … … ১৭৯
মানুষ … … … ১৮৫

বনফুলের আরও গল্প

সুন্দর জ্যোৎস্না !

চারিদিকে জনমানবের সাড়া নাই। গভীর রাত্রি। দূর হইতে নদীর কলকল-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। নির্জ্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। স্বপ্ন-বিহ্বল নেত্রে দেখিতেছি, জ্যোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। কুৎসিত জিনিসও সুন্দর হইয়া উঠিল। ওই পচা-ডোবাটাও যেন জরিদার কাপড় পরিয়া মোহিনী সাজিয়াছে। আকাশের কালো মেঘটাতেও রূপালি আবেশ।

নির্জ্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। তাহারই প্রতীক্ষায়। তাহারই প্রতীক্ষায় এই গভীর রাত্রির সমস্ত জ্যোৎস্নাও যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আসিতেছে।—হ্যাঁ ওই যে। সর্ব্বাঙ্গে তাহার জ্যোৎস্নার আকুলতা তাহার নূপুর শিঞ্জনে জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিতেছে।···ওই সে আমার পানে চাহিয়া হাসিল।

সহসা একটা দুর্দ্ধর্ষ দস্যু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই কিশোরীর বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। জ্যোৎস্নায় শাণিত ছোরাটা চক্-চক্ করিয়া উঠিল! রক্তের ধারায় জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিলাম। ধরিয়া দেখি—একি, এ যে আমারই বিবেক।

ঐরাবত

এক

ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয় বহু গুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্ম্মিক—প্রচণ্ড সংযমী—অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই। শরীরের প্রতি তাঁহার ভীষণ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যহ মুগুর ভাঁজিতেন—তিনবার দন্তধাবন করিতেন—দুইবেলা স্নান করিতেন। পালোয়ানের মত স্বাস্থ্য। লেখা-পড়াও জানিতেন—শোনা যায় তিনি বি-এ পাশ। দরিদ্র নন—খাইবার পরিবার সঙ্গতি আছে, চাকুরি করিতে হয় না। পৈত্রিক জমিজমা যাহা আছে, তাহাতেই চলিয়া যায়। হাতে দু'পয়সা আছে। কিন্তু ত্রিগুণাবাবুর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তাঁহার মৌলিকতা। এবং তাঁহার মৌলিকতার মূলকথা সকল জিনিসের গোড়া বাঁধিয়া কাজ করা।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-ধারণ প্রণালী সংক্ষেপত এই। তিনি উঠিতেন খুব ভোরে। উঠিয়াই কার্ব্বলিক লোশনে ভিজান নিমের দাঁতন লইয়া দন্ত-পরিষ্কার করিতেন। তাহার পর করিতেন ব্যায়াম। মুদ্গর, ডাম্বেল, ডেভালাপার। অর্দ্ধঘণ্টা কাল ব্যায়াম করিয়া তিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিকটবর্ত্তী নদীটিতে গিয়া অবগাহন স্নান করিতেন।

স্নান শেষ করিয়া ভৈরোঁ রাগিণীতে একটি ভজন গাইতে গাইতে তিনি বাড়ী ফিরিতেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম প্রাতঃকালে অবগাহন তাঁহার করা চাইই। বাড়ী ফিরিয়া তিনি ষ্টোভ জ্বালিতেন।

আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন চা খাইবার জন্য।

মোটেই তা নয়। কোনরূপ মাদকদ্রব্যের বশীভূত তিনি ছিলেন না। ষ্টোভ জ্বালিয়া তিনি ভাতে-ভাত চড়াইয়া দিতেন। ষ্টোভের

নিকট বসিয়া তাঁহাকে আহ্নিকটাও শেষ করিয়া লইতে হইত। প্রাণায়ামও করিতেন। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ত্রিগুণাবাবুর আহ্নিক, স্নান, আহার সমস্তই সমাধা হইয়া যাইত। কম্‌প্লিট।

তিনি বলিতেন যখন খাইতেই হইবে—অনাহারে থাকা যখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত—তখন ও বখেড়া সকাল সকাল চুকাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত!

সমস্তদিন সময় পাওয়া যায় কত!

আহারাদি শেষ করিয়া তিনি একজোড়া মিলিটারি বুট পরিধান করিতেন। মিলিটারি বুট পরিলে আরও যে সব আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদ পরিধান করা সাধারণ লোকে সঙ্গত মনে করেন ত্রিগুণাবাবু সে সবের ধার ধারিতেন না। তিনি বুটজুতা পরিতেন কেবল বখেড়া মিটাইয়া রাখিবার জন্য। একবার সকালে উঠিয়া বাগাইয়া পরিয়া ফেলিতে পারিলে—ব্যাস নিশ্চিন্ত।

অন্য জুতা পরিলে বার বার খোল আর পর—খোল আর পর। সময় নষ্ট হয় কত!

তাহার পর তসরের কাপড়টি মালকোচা মারিয়া পরিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন। তসর কাপড়ের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল—ওই একই কারণে। একবার কিনিলেই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

আরও দুইটি জিনিস তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

একটি মোটা বাঁশের লাঠি। যেমন তেমন লাঠি নয়। বেশ শক্ত তৈলপক্ক গাঁটে গাঁটে লোহার তার জড়ানো সমর্থ একখানি লাঠি। আর থাকিত চামড়ার একটি বড় ব্যাগ—পোষ্টাফিসের পিওনরা সাধারণত যে জাতীয় ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায়—সেই জাতীয়

একটি ব্যাগ। ব্যাগটি তিনিও কাঁধে ঝুলাইয়া লইতেন। ব্যাগটিতে তাঁহার টুকিটাকি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকিত। যথা—কপিং পেন্সিল একটি বাঁধান নোটবুক—শুকনো খেজুর—টিঞ্চার আয়ডিন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া মাথায় তাঁহার একটি টোকা থাকিত। যে টোকা পরিয়া কৃষকগণ মাঠে চাষ করিয়া থাকে। রৌদ্রবৃষ্টি নিবারণকল্পে বেশ মজবুত গোছের একটি টোকা ত্রিগুণাবাবু কৃষকদের দ্বারাই প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। ছাতার বখেড়া মিটিয়া গিয়াছিল। সর্ব্ববিষয়ে গোড়া বাঁধিয়া এবং বখেড়া মিটাইয়া কাজ করাই ত্রিগুণাবাবুর বিশেষত্ব। দাড়িগোঁফ সম্বন্ধেও তিনি বখেড়া মিটাইয়া ছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারা মনের আনন্দে বাড়িয়া—তাঁহার মুখ ত বটেই—বুক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

ত্রিগুণাবাবু জামা পরিতেন না।

প্রশ্ন করিলে গোছা গোছা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভ্রূর অন্ধকারে অবস্থিত তাঁহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিত। বলিতেন—“গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামা একটা বখেড়া নয় কি?”

সকলেই স্বীকার করিত—বখেড়া।

বাঁশের লাঠিটি ভীষণদর্শন।

ত্রিগুণাবাবুও রাগী লোক।

সুতরাং বখেড়া বাড়াইয়া লাভ কি!

কিন্তু যখন মিলিটারী বুট পায়ে, মালকোঁচা-মারা, উপবীতধারী নগ্নগাত্র বলিষ্ঠ বখেড়া-বিরোধী ত্রিগুণাবাবু হাতে বাঁশের লাঠি, কাঁধে

চামড়ার ব্যাগ এবং মস্তকে টোকা পরিয়া পথে বাহির হইতেন, তখন তাহা সত্যই একটি দেখিবার মত দৃশ্য হইয়া উঠিত।

অনেকে হাসিত—

অনেকে ঠাট্টা করিত—

অনেকে প্রণামও করিত।

ত্রিগুণাবাবু অবশ্য এ সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। প্রাকৃতজনের স্তুতিনিন্দা তাহার নিকট চিরকাল উপেক্ষার বস্তু ছিল।

স্ত্রী?—তিনি বহুপূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাবাবুর দুইটি পুত্র অবশ্য আছে। তাহার মামার বাড়ীতে মানুষ হইতেছে। তাহাদের নামকরণ ব্যাপারেও ত্রিগুণাবাবুর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একজনের নাম রাখিয়াছিলেন রায় বাহাদুর—আর একজনের রায় সাহেব।

বলিয়াছিলেন—"রায় বাহাদুর—আর রায় সাহেব হবার জন্যে পরে হয় ত ব্যাটারা প্রাণপাত করবে। আগে থাকৃতে বখেড়া মিটিয়ে রাখাই ভালো।"

দুই

অতি প্রত্যূষে আহারাদি শেষ করিয়া ত্রিগুণাবাবু চার ক্রোশ দূরবর্ত্তী কিষণপুর গ্রামে চলিয়া যাইতেন। সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য—গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া। ত্রিগুণাবাবু ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিতায় আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্য্যের মর্ম্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয় তাহা হইলে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে। গোড়া বাঁধিয়া কাজ করাই তাঁহার নিয়ম।

সুতরাং তিনি অল্পবয়স্কদের—বিশেষ করিয়া বালকদের লইয়া পড়িয়াছিলেন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন—ইহার জন্য তাঁহাকে চারক্রোশ দূরে যাইতে হয় কেন? নিজের গ্রামে কি বালক ছিল না?

ছিল।

কিন্তু কেহ তাঁহাকে আমল দিত না।

গ্রামস্থ যোগী ভিক্ষা পায়না—একথা সুবিদিত।

চারক্রোশ দূরে ত্রিগুণাবাবুর কয়েক বিঘা জমি প্রজাবিলি করা ছিল। প্রজাদের উপর তাঁহার প্রভাবও ছিল।

সুতরাং তাহাদের পুত্রদের তিনি অনায়াসে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন। বালকেরা সকাল হইতে নয়টা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া তাহার পর স্থানীয় বিদ্যালয়ে মামুলি লেখাপড়া শিখিতে যাইত।

একটি সুবিশাল বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াই ত্রিগুণাবাবু তাঁহার উপদেশাবলী বিতরণ করিতেন।

একদিন হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে বখেড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। ত্রিগুণবাবু বখেড়া বিরোধী।

সুতরাং তিনি বখেড়া মিটাইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। দ্বারে দ্বারে চাঁদার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ওই বটবৃক্ষতলেই একটা পাকাঘর তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

তিন

কিন্তু অকস্মাৎ নূতন একটা বখেড়া বাধিয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিগুণাবাবু গিয়া দেখেন ব্রহ্মচর্য্যলোলুপ তাঁহার সমস্ত ছাত্রবৃন্দ বটবৃক্ষমূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তন্ময়চিত্তে একটি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছে।

ত্রিগুণাবাবু আসিতেই ত্রস্ত হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিল। মাসিক-পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

তুলিয়া তিনি দেখিলেন।

দেখিবামাত্রই চক্ষু-স্থির।

প্রথমেই মলাটের উপর ঢেউখেলান রঙীন অক্ষরে লেখা—"মরমী" তাহার পর পাতা উল্টাইতেই একটি নগ্ন নারীমূর্ত্তি!

তাহার পরই একটি কবিতা।

কবিতার ছন্দ বোঝা যায় না—

অর্থ কিন্তু পরিষ্কার।

পড়িবামাত্র মৌলিক ত্রিগুণাবাবুও একটি অত্যন্ত অমৌলিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তাহার পরেই একটি গল্প—

একটি রোগা গাছের ছোকরা একসঙ্গে চারিটি তরুণীর মোহড়া লইতেছে।

এ ত ভয়ানক কাণ্ড!

পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া ত্রিগুণাবাবু দেখিলেন—সব সরিয়া পড়িয়াছে।

একটি ছাত্রও নাই।

চার

সেইদিনই ত্রিগুণাবাবু কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ঠিক ইহার দুই দিন পরে যে সংবাদটি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। তাহা এই।

“মরমী” কাগজের সম্পাদক গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতাল অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে।

চিত্রকর নিধিরাম বসাকও অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়ী। তাঁহার মস্তকের আঘাতও সাঙ্ঘাতিক।

গল্পলেখক সুজিৎ সেনের দক্ষিণ হস্তটি শোচনীয়ভাবে জখম হইয়াছে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন তাহা কাটিয়া না ফেলিলে নাকি তাঁহার জীবন-সংশয়।

কবি অমিয় পালিত মারা গিয়াছেন।

একজন ভীষণদর্শন লোক অকস্মাৎ “মরমী” অফিসে ঢুকিয়া বিনা কারণে উক্ত মনস্বী-চতুষ্টয়কে আচম্বিতে আক্রমণ করে এবং একটি

বাঁশের লাঠির দ্বারা তাঁহাদের গুরুতররূপে প্রহার করিতে থাকে। লোকজন আসিয়া পড়া সত্ত্বেও কিন্তু কেহ গুণ্ডাটাকে ধরিতে পারে নাই। সে সকলের হাত ছিনাইয়া ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বুঝিলাম আর কেহ নয়—ত্রিগুণাবাবুই।

বখেড়া মিটাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।

পাঁচ

ত্রিগুণাবাবু নিরুদ্দেশ।

কোন সঠিক খবর তাঁহার কেহ পাইতেছে না।

নানারূপ গুজব রটিতে লাগিল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, তিনি তরুণ সাহিত্যিকগণকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি টেররিষ্ট দল গড়িয়া তুলিতেছেন।

কাহারও মতে তিনি ভারতবর্ষেই নাই—খালাসির বেশে জাহাজে চাপিয়া রাশিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আর একদল দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিল—ওসব বাজে কথা—তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদলভুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ নানা কথা।

লোকে কিন্তু এক কথা বেশীদিন বলিতে চাহে না।

তাহারা ক্রমশঃ ত্রিগুণানন্দের কথা ছাড়িয়া অন্য কথায় মাতিল!

ত্রিগুণানন্দ-গুজব-ভারাক্রান্ত দিবসগুলি ক্রমে ক্রমে কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

লোকে ক্রমশঃ ত্রিগুণাবাবুর কথা ভুলিতে লাগিল। এমন কি পুলিশও।

ছয়

আমারও মনে যখন ত্রিগুণাবাবুর স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একখানি চিঠি আসিয়া হাজির।

ত্রিগুণাবাবুরই চিঠি।

লিখিয়াছেন—

ভায়া,

অনেকদিন পরে আমার চিঠি পাইয়া সম্ভবত বিস্মিত হইবে। বিস্ময়ের কিছু নাই—এতদিন আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতায় যে কাণ্ড করিয়াছিলাম খবরের কাগজের মারফত আশা করি তাহা অবগত আছ। পরে বুঝিয়াছিলাম কাণ্ডটি করিয়া ভুল করিয়াছি। বখেড়া অত সহজে মিটিবার নয়। আমি যে ভাবে উহা মিটাইতে চাহিয়াছিলাম সে ভাবে মিটাইতে হইলে কলিকাতা সুদ্ধ সবাইকে খুন করিতে হয়। কলিকাতা শহরে, যেখানে যত মাসিক পত্রিকা বিক্রয় হয় সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। সমস্ত ষ্টলগুলি পরিদর্শন করিয়া, সিনেমা দেখিয়া এবং আধুনিক যুবক-যুবতীদের সংস্পর্শে আসিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল—রক্তারক্তির রাস্তা ধরিলে সকলকেই সাবাড় করিতে

হয়—কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। ঠগ বাছিতে গেলে গ্রাম উজাড় করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতা উজাড় করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং ও পথ আমার পক্ষে অপ্রশস্ত। পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকি—মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি এবং চিন্তা করি কি উপায়ে বখেড়া মিটানো যায়। ইহাই যদি দেশের প্রগতি হয়, তাহা হইলে সে প্রগতির শেষফল দেখিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত কেহ বাঁচিয়া থাকিবে কি? থাকিবে না ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ অবস্থায় কোন পন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত তাহাই একদা রাত্রে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় মনে হইল মানস-পটে সিনেমা দৃষ্ট এক নায়িকার মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। মুখখানি যেন আমার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বলা বাহুল্য—একটু বিব্রত হইলাম।

কিন্তু যাক্ ঈশ্বরেচ্ছায় কিছুক্ষণ পরে মুখ মন হইতে সরিয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুমাইবার পরই বোঝা গেল বখেড়া মেটে নাই—কারণ সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নে কি ঘটিল লিখিতে পারিব না। এইটুকু শুধু জানিয়া রাখ, তাহা অবর্ণনীয়।

ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখিলাম ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে এবং হৃৎপিণ্ড বক্ষপঞ্জরে মাথা কুটিতেছে। স্বপ্নের ভয়ে সমস্ত রাত জাগিয়া রহিলাম। কিন্তু দেখিলাম জাগিয়াও নিস্তার নাই—মুখ ক্রমাগত মনের মধ্যে যাওয়া আসা করিতে লাগিল।

এইরূপ প্রত্যহ। কোনদিন সিনেমায় দেখা নায়িকা, কোনদিন মাসিকে দেখা ছবি, কোনদিন রাস্তায় দেখা তরুণী—একটা না একটা কেহ প্রত্যহই আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিতে লাগিলেন।

বলব কি ভায়া, শেষটা উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলাম।

ভয়ও হইল। চিন্তা করিতে লাগিলাম—এ অবস্থার প্রতিকার কি! মাঝে মাঝে রাগও হইত—কিন্তু স্বপ্নের মাথায় ত লাঠি মারা যায় না। ঘোর জালে পড়িয়া গেলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা কথাটা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলাম।

এই ভাবে দিন যায়। ক্রমশ এই সত্যটি আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, আমার মনের কামনা মরে নাই—ঘুমাইয়াছিল। সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষুধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবী করিতেছে।

কি উপায় করি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এক দিন সহসা পৌরাণিক গল্প মনে পড়িয়া গেল।

গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিল।

তোড়ের মুখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কাবু হইয়া যায়।

আশা করি তুমি গল্পটা জানো।

……সুতরাং, কাল বিলম্ব না করিয়া বখেড়া মিটাইয়া ফেলিয়াছি। কিছু অর্থব্যয় করাতে পুলিশের বখেড়াও মিটিয়াছে। আগামী পরশ্ব গ্রামে পৌঁছিব তুমি আমার বাড়ীটা পরিষ্কার করিয়া রাখিও। সম্ভব হইলে দেওয়ালগুলিতে চুণকাম করাইয়া দিও। মোট কথা চতুর্দ্দিক বেশ পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। সাক্ষাতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। ইতি—ত্রিগুণানন্দ।

সাত

ঐরাবত আসিতেছেন।

ষ্টেশনে গেলাম।

যথা সময়ে ট্রেন আসিল এবং ঐরাবত অবতরণ করিলেন।

সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান-দুরস্ত তন্বী তরুণী।

ঐরাবতের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

ঐরাবত 'ক্লীন শেভড'—গোঁফদাড়ি একেবারেই নাই।

মাথায় দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা।

মুখে একটি সুদৃশ্য পাইপে জলন্ত সিগারেট।

পরিধানে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জরিপাড় মিহি ধুতি।

পায়ে পেটেণ্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্প্‌স্ু! হাতে সোনার রিষ্টওয়াচ।

সর্ব্বাঙ্গ হইতে ভুর ভুর করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছাড়িতেছে। আমি নির্ব্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

চমক ভাঙ্গিল যখন ত্রিগুণানন্দ বলিলেন—"হাঁ করে দেখছিস কি? এই তোর বৌদি! বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।"

হেঁট হইয়া বৌদির পদধুলি গ্রহণ করিলাম।

উৎসবের ইতিহাস

এক

সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

—স্যাণ্ডেল মশাইকে আরো চারিটি পোলাও দাও।

—আন্—আন্—ওরে এদিকে লুচি নিয়ে আয়—লুচি—লুচি।

মাংস আপনাকে দেব আর একটু?

—না—না—সে কি কথা! দাও খানিকটা মাংস—

—ডাল—ডাল— চাই—ডাল।

—ছ্যাঁচড়া—ছ্যাঁচড়া।

ওহে—ছ্যাঁচড়া রেখে তুমি পায়েসটা আর একবার ঘুরিয়ে দাও দিকি—

—এ হে হে জলের গেলাসটা পা লেগে পড়ে গেল যে! তোমরা দেখেও চলতে পার না? উটের মত চলছ সব!

—এই রসগোল্লা এদিকে এস—মুখুজ্জে মশাইকে গোটাআষ্টেক দাও—খাইয়ে লোক উনি—

—তুমি যাও ত হে—কয়েক 'পিস্' ভাল দেখে মাছ বেছে বেছে নিয়ে এস ত—মিত্তির মশাইকে দাও—

—দেখো হে, আথতার মিঞা আলাদা বসেছেন ব'লে যেন কিছু বাদ না পড়ে! নরেন তুমি ওঁর কাছেই থাক—

—সিঙ্গি মশাইকে খানিকটা ছ্যাঁচড়া দিয়ে যাও—চাট্‌নিও—

নানা আকৃতির জন তিরিশেক লোক আহারে প্রবৃত্ত।

জন পাঁচ-ছয় ছোকরা পরিবেশন করিতেছে।

স্বচক্ষে দেখিলে তবে বিশ্বাস হইবে।

না দেখিলে মনে হইবে শতখানেক লোক ভিতরে দাঙ্গা করিতেছে।

দুই

ঠিক ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়টি করুণ রসাত্মক।

কিন্তু সত্য।

প্রবীন মল্লিক মহাশয় 'থাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়ের নিকট টাকা ধার করিতেছেন। অসহায় মল্লিকের ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে ত!

দেখা গেল মুখুজ্জে বাস্তবিকই সহৃদয় লোক।

চাহিবামাত্র টাকাটা ঝড়াৎ করিয়া দিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—"ফিষ্টি একটা করতে হবে বইকি! ফিষ্টি না করলে চলে! এ কটা টাকা—যদি সিক্‌স্ পারসেণ্টই দাও—কদিন যাবে শুধতে! অমন তৈরি ছেলে তোমার! বড় ভাল ছোকরা নরেন—বড় ভাল—ভাগ্যবান লোক তুমি, ঠিক উন্নতি করবে ও—দেখো—"

মুখুজ্জের অর্থে উৎসবের আয়োজন হইল।

পোলাওটা সামান্য একটু ধরিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে বিশেষ রস-ভঙ্গ হয় নাই।

সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়াছে।

তিন

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা পরম্পরা একটু জটিল।

সংক্ষিপ্ত তালিকাবদ্ধ আকৃতি নিম্নলিখিত রূপ।

(১) অনন্যোপায় নরেন মল্লিক (প্রবীণ মল্লিকের পুত্র) দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সাগ্রহে বিশু সান্ন্যালকে তৈলাক্ত করিতেছে।

(২) তৈলনিষিক্ত বিশু সান্ন্যাল দিশাহারা হইয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

(৩) খবরটি গোপন রহিল না।

(৪) ফলে, বিশু সান্ন্যালের প্রতিদ্বন্দী ও সমশক্তিশালী বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তীও সক্রোধে লেখনী আস্ফালন করিলেন এবং একখানি পত্র লিখিলেন।

(৫) উভয় পত্রই আখ্‌তার আলীর হস্তগত হইল এবং সমস্যাকুল চিত্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৬) বিশু সান্ন্যালকে সুচারুরূপে তৈলাক্ত করিবার পর নরেন মল্লিক আবিষ্কার করিল যে তাহার তৈল-নিষেক-শক্তি মোটেই নিঃশেষিত হয় নাই! এখন সে বহুলোককে তৈল-সুখ দিতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ করা অনুচিত।

সে গিয়া ‘থাইয়ে’ মুখুজ্জে মহাশয়কে প্রশ্ন করিল এইবার কাহাকে তৈলাক্ত করি বলুন ত! আখতার আলিকে গিয়া ধরিব কি?

ঈষদ্ধাস্যসহকারে মুখুজ্জে বলিলেন সুবিধা হইবে না। আখতার আলি নিরামিষ তৈল পছন্দ করেন না। তুমি বরং সিঙ্গীর কাছে যাও। পরাণ সিঙ্গী ঘাগি লোক! যদি রাজী করতে পার—নির্ঘাৎ লেগে যাবে।

(৭) অবিলম্বে তৈল ও তুলি লইয়া নরেন মল্লিক পরাণ সিংহের দ্বারস্থ হইল এবং তাহাকেও যৎপরোনাস্তি তৈলাক্ত করিল।

(৮) তৈলাত্র´ সিংহ মহাশয় নরেনকে আশ্বাস দিলেন এবং সঙ্গে লইয়া পান্নু মিত্রের নিকট গেলেন।

(৯) ঘাগি-ঘুঘু সম্মিলন হইল। পান্নু মিত্তির ঘুঘু। বোঝা গেল তিনি কেবলমাত্র তৈল-নিষেকে নরম হইবার পাত্র নহেন। তিনি নরেন মল্লিকের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে অকস্মাৎ একটি নিরীহ মতলব আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি সিংহ মহাশয়কে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কর্ণকুহরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব বলিতে লাগিলেন। ঘাগি-ঘুঘু-সংবাদ নরেনের অগোচর রহিয়া গেল।

(১০) প্রকাশ্যে পান্নু মিত্র নরেনকে কেবল বলিলেন, "শুধু হাতে হবে না হে। একটা ভালোগোছের ডালি চাই—বুঝলে? ডালিটি নিয়ে কাল বিকেলে এসো—দু বোতল হুইস্কিও এনো—"

(১১) ঘাগি সিঙ্গি মহাশয় ঘুঘু মিত্তিরের নিকট গোপনে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা প্রবীণ মল্লিক মহাশয়ের অর্থাৎ নরেনের পিতার কর্ণগোচর করিলেন।

প্রবীণ মল্লিককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হইতে হইল।

(১২) পরদিন ঘুঘু-সমভিব্যাহারে স-ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।

(১৩) ইহার ফলে সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণীজন-সুলভ। তিনি নরেনকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 'ফোন' করিলেন।

(১৪) সমস্যাচ্ছন্ন আখতার আলি বসিয়া বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতেছিলেন—এমন সময়—টিং—টিং—টিং—ফোন বাজিয়া উঠিল।

(১৫) আখতার আলি অন্ধকারে ধ্রুবতারা সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার সমস্যা বিদূরিত হইল।

(১৬) নরেন নির্ব্বিঘ্নে কেল্লা মারিয়া দিল।

চার

যে ঘটনাটি এখনও ঘটে নাই কিন্তু যাহা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহার উল্লেখ না করিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে।

তাহা এই—নরেন মল্লিককে ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্থা কুৎসিত কন্যাটির পাণি-পীড়ন করিতে হইবে।

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়াই ঘুঘু মিত্তিরের মধ্যস্থতায় নরেন সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়াই নিয়োগকর্ত্তা আখতার আলির জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে—অর্থাৎ নরেনের এত দিনের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

সংক্ষেপে, সে চাকুরি পাইয়াছে।

হউক কেরাণীগিরি—হউক বেতন তিরিশ টাকা—

চাকুরি ত!

প্রস্‌পেক্‌টও আছে।

উপরোক্ত ভোজন উৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

পাঁচ

অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই আর একটি কথা ইতস্ততঃ করিয়া সর্ব্বশেষে উল্লেখ করিতেছি।

নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম, এ।

অলকনন্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক

"শশকগণের সহিত মেষগণের ঘোরতর সংঘর্ষ! উভয় পক্ষেরই আর্য্যশোণিত আকস্মিক উন্মাদনায় মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়াছে। ভীষণ আরবে সকলের কর্ণপটহ বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম। সত্যই এরূপ শব্দ-ঝঙ্কার অশ্রুতপূর্ব্ব। ওই শোন—শশকগণের দামামা-ধ্বনি মেষদের নাকাড়া-নিনাদকে ছাপাইয়া উঠিতেছে—আবার সঙ্গে সঙ্গে মেষগণের তূর্য্যাস্ফালন শশকদিগের ভেরী-হুঙ্কারকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।

চরাচর কম্পমান।

শকুনি গৃধিনী প্রভৃতি হিংস্র পক্ষীকুল চক্রাকারে গগনে উড্ডীয়মান। সিংহগণ এই লোমহর্ষণ সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিণতি চিন্তা করিয়া সভয়ে রুদ্ধশ্বাসে ইষ্টনাম জপ করিতেছে।

আকাশে বাতাসে আশঙ্কা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—"

বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যঙ্গকার দিগিন্দ্র সোম ক্ষিপ্ত হইয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কহিল—

"ধনেশ একপয়সা দেবে না—পাকা খবর শুনে এলাম—"

দিগিন্দ্রের লেখনী হস্তচ্যুত হইল।

তিনি ব্যায়ত আননে হেবোর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দুই

অতি আধুনিক জনৈক প্রতিভা—অর্থাৎ সুকবি পঙ্কু মিত্র—হর্ষোৎফুল্ললোচনে গদ্য ছন্দে কাঁদিয়াছিলেন—.

শাওন রাতের প্রিয়া
ওগো শুনছ ?
এসো তুমি তোমার নরম পা ফেলে ফেলে
আমার মনের ওপর।
এসো।
হয়ত তোমার কষ্ট হবে একটু,
কারণ মন যে আমার গোটা নয়—
তোমার নরম পা রাখবে কোথায় তুমি!
লক্ষ টুক্‌রোয় ভাঙা যে আমার মন
তোমার গোটা নরম পা দুখানি রাখবার মত
গোটা মন নেই ত!
তবু এসো ভাই তুমি
বুঝলে ?
ওগো
শাওন রাতের প্রিয়া আমার!…

হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—কেন আর মিছিমিছি—"

বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া কবি বলিলেন—"সত্যি বলছেন আপনি !"

হেবো চটিয়া বলিল—"বিশ্বাস না করেন—লিখে যান—"

লেখনী ত্যাগ করিয়া কবি কহিলেন—"এ কি খবর শোনালেন আপনি এই দারুণ দুপুরে"—অৰ্দ্ধদগ্ধ বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটি ফেলিয়া দিলেন এবং প্রাচীর-সংলগ্ন টিক্‌টিকি-দম্পতির পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন। উহারাই তাঁহার উপরোক্ত কবিতাটি উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল।

তিন

বিখ্যাত জীব-বিদ্যা-বিশারদ প্রখরেশ পাল বিদ্যা-সমুদ্র মন্থন করিয়া অপূৰ্ব্ব প্রবন্ধ-রত্ন—"উটপাখীর ডিম্ব"—উদ্ধার করিতেছিলেন। প্রখরেশ ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি। তাঁহার চতুর্দ্দিকে নানারূপ ভয়াবহ আকৃতির বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা উত্তুঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রায় সমাধিস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। উট পাখীর ডিম্ব সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিতের মতামত তিনি তন্ময়চিত্তে প্রণিধান করিতেছিলেন।

হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কহিল—"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—কেন মিছে খেটে মরছেন !"

"অ্যাঁ—বলেন কি !"

পাল মহাশয়ের চশমা নাসিকা-চ্যুত হইল।

ডিম ভাঙিয়া উষ্ট্রপক্ষী নিমেষে মরীচিকায় বিলীন হইয়া গেল।

হেবো হাসিয়া বলিল—"ঠিকই বলছি—নিট খবর !"

পাল মহাশয় নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্তূপীকৃত গ্রন্থরাজির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

চার

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক মুরারিমোহন "সর্পিনী" নামে একটি চমকপ্রদ গল্প সুরু করিয়াছিলেন। মুরারিমোহনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি গল্প অল্প করেন না। "সর্পিনী" গল্পের ষোড়শী তন্বী নায়িকা তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষকে হত্যা এবং পাঁচজনকে মৃতপ্রায় করিয়া গলায় দড়ি দিতে উদ্যত হইয়াছিল—

এমন সময় হেবো আসিয়া উপস্থিত।

তাহার বার্ত্তা পূর্ব্ববৎ।

ধনেশ এক পয়সা দিবে না।

মুরারিমোহন মুখে বলিলেন বটে—"যাক্ বাঁচা গেল!"

তাঁহার অন্তরাত্মা কিন্তু অন্য কথা বলিতে লাগিল।

পাঁচ

পণ্ডিত প্রভাকর শর্ম্মা "গীতার রাজ-নৈতিক আদর্শ" লিখিতেছিলেন।

হেবো আসিয়া তাঁহাকে আদর্শ ভ্রষ্ট করিল।

শর্ম্মা মহাশয় প্রথমটা হেবোর কথা বিশ্বাসই করিতে চান না।

হেবো কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়।

অবশেষে শর্ম্মা মহাশয়কে বিশ্বাস করিতেই হইল যে, ধনেশ সত্যই পয়সা খরচ করিতে রাজী নয়।

বিশ্বাস হইবামাত্র তিনি গামছা পরিয়া তেল মাখিতে বসিয়া গেলেন।

উদ্দেশ্য গঙ্গা-স্নান করা।

এই গ্রীষ্মে 'গীতার রাজ-নৈতিক আদর্শ' লইয়া মাথা ঘামানো অপেক্ষা গঙ্গা-স্নান করা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল।

ছয়

প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠকও মুদ্গর পরিত্যাগ করিয়া দেশের কল্যাণার্থে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল—"প্রাণায়াম ও ব্যায়াম"। রচনাটি গবেষণামূলক।

তিনি প্রমাণ করিতে চাহিতেছিলেন যে, প্রাণায়ামহীন ব্যায়াম করার কোন সার্থকতা নাই। চিনি-হীন সন্দেশের ন্যায় তাহা নিতান্তই অর্থ-হীন। ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীরামচন্দ্র, হনূমান প্রমুখ পৌরাণিক বীরগণ প্রাণায়াম করিতেন কিনা তাহাই তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি উল্টাইয়া আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় ছিলেন—

এমন সময় হেবো আসিয়া হাজির।

বলে কি!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা পাঠকজির ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল।

রক্তাভ চক্ষু দুইটি হইতে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল।

গর্দ্দানের ও বাহুযুগের পেশীসমূহ ফুলিয়া উঠিল।

তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

"ইয়ার্কি না কি? পয়সা দেবো না! একটি ঘুষিতে ব্যাটার—"

হেবো সরিয়া পড়িল।

সাত

ঐতিহাসিক বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় একটি অতিশয় মৌলিক প্রবন্ধের মালমশলা জোগাড় করিতেছিলেন।

প্রবন্ধের নাম—"আলিবর্দ্দী খাঁ নামে সত্যই কি কেহ ছিলেন ?"

হেবো আসিয়া তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টায় বাধা দিল।

ধনেশ এক পয়সা দিবে না।

আলিবর্দ্দী খাঁর অস্তিত্ব ছিল কি না সে চিন্তা সুতরাং নিরর্থক।

দাঁ মহাশয় রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন। ঐতিহাসিক হইলেও কবিরাজী তাঁহার পেশা।

আট

এই প্রকারে হেবো প্রায় পঞ্চাশজন লেখককে নিবৃত্ত করিল।

সে পাকা খবর পাইয়াছে, ধনেশ এক পয়সাও খরচ করিবে না।

সুতরাং 'অলকনন্দা' নামে যে মাসিক পত্র বাহির হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল তাহা আর বাহির হইবে না।

দিগিন্দ্র সোম কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়া ধনেশ পোদ্দার ইহার জন্য দশ হাজার মুদ্রা খরচ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

কিন্তু কে নাকি তাহাকে ভুজুং দিয়াছে, টাকাটা জলে পড়িবে।

ফলে ধনেশ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

দিগিন্দ্র সোম কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন।

তিনি সহজে কোন ব্যাপারে হাল ছাড়েন না। অনেক নৌকাই তিনি বহু দুর্য্যোগে তীরে ভিড়াইয়াছেন। তা'ছাড়া শক্তিশালী লোক। প্রথমত রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত ব্যঙ্গকার, তৃতীয়ত শুধু তাঁহার লেখনীরই জোর নাই—গলারও জোর আছে।

অথচ হঠকারি নহেন।

মাথা ঠাণ্ডা।

'অলকনন্দা' বাহির হইলে তাঁহারই সম্পাদক হইবার কথা। বেশ মোটা মাহিনা মিলিবার আশা ছিল সুতরাং সোম মহাশয় হাল ছাড়িলেন না। কি ভাবে চলিলে 'পানি' পাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, যদিও ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ কিন্তু এই সব কার্য্য (বস্তুত যে কোন বৃহৎ কার্য্যই) সুচারুরূপে হাঁসিল করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তিনি দল পাকাইলেন।

আশাহত যাবতীয় লেখকবৃন্দ তাঁহার দলে জুটিল।

উদ্দেশ্য—যেমন করিয়া হোক ধনেশকে পুনরায় তাতাইতে হইবে।

বিবাহের স্বাভাবিক পরিণতি যেমন প্রজাবৃদ্ধিতে—সঙ্ঘের স্বাভাবিক পরিণতি তেমনি সভায়। নিষ্ফলা বিবাহ বরং সম্ভবে—কিন্তু নি-সভা সঙ্ঘ অসম্ভব।

সুতরাং অচিরেই দিগিন্দ্র সোমের সভাপতিত্বে একটি সভা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

কথা হইল সভা মাঠে বসিবে।

বাড়ীতে সভা আহ্বান করিলে এতগুলি লোককে চা-চুরুট জোগানো সোম মহাশয়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইত—দ্বিতীয়ত তাঁহার বাড়ীতে স্থানাভাব। এতগুলি লোককে বসাইবার মত প্রশস্ত স্থান তাঁহার ভাড়াটে বাসায় ছিল না। সুতরাং সভা মাঠে বসিবে ঠিক হইল। কিন্তু তাহাতেও গোলযোগ ঘটিল। মাঠে এতবড় সভা করিতে হইলে পুলিশের অনুমতি চাই। দিগিন্দ্র বাবু সভাপতি জানিলে পুলিশের অনুমতি পাওয়াও মুস্কিল। সুতরাং নির্ব্বাচিত কয়েকজন সভ্য লইয়া একটি ছোট পরামর্শ সভা বসিবে স্থির হইল। মাঠেই বসিবে।

নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম—

(১) দিগিন্দ্র সোম
(২) সুকবি পঞ্চু মিত্র
(৩) বৈজ্ঞানিক প্রখরেশ পাল
(৪) গল্প-লেখক মুরারিমোহন সাঁতরা
(৫) ব্যায়াম-বীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠক
(৬) ঐতিহাসিক কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ
(৭) হেবো—

অর্থাৎ সপ্তরথী সম্মিলন।

দুর্দ্দমনীয় দিগিন্দ্র সোম অধিনায়ক। সভা বসিল।

দিগিন্দ্র বাবু তাঁহার অনিন্দনীয় ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা কি এখনও বাঁচিয়া আছি? আমরা জীবিত—না, মৃত? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি নির্ভর করিতেছে। আশা করি, আপনারা অবগত আছেন কেন আজ আমি আপনাদের

আহ্বান করিয়াছি। পরম স্নেহাস্পদ হেবো আপনাদের প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যে বার্ত্তা বিতরণ করিয়া ফিরিয়াছে তাহার সম্যক অর্থ কি আপনারা সকলে উপলব্ধি করিয়াছেন ? আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহার সরল অর্থ এই—ধনগর্ব্বিত ধনেশ পোদ্দার সমস্ত লেখক জাতির মুখে জুতা মারিয়াছে। এই পাদুকা-কর্দ্দম-লাঞ্ছিত মুখ আর কি আমরা সভ্যসমাজে দেখাইতে পারিব ? আমরা দরিদ্র তাহা ঠিক, আমরা অসহায় তাহাও ঠিক, ভাগ্যনিয়ন্তা ভাগ্যহীন করিয়াই আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি দেশের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা প্রাণপাত করিতেছি না কি ? নিরন্ন আমরা অশক্ত দেহে বাণীসাধনার একাগ্রতায় কত বিনিদ্র রজনী যে যাপন করিয়াছি ধনেশ কি তাহার খবর রাখেন ? তিনি আমাদের বাণীপূজার সহায়ক হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ইহা আমরা সকলেই জানি। হঠাৎ কোন্ অধিকারে তিনি আমাদের অপমান করিলেন ? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছি—ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই ?"

পুষ্কর পাঠক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

দন্ত কড়মড় করিয়া পেশীবহুল মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত করত বলিয়া উঠিলেন—"বলেন ত এক্ষুণি ব্যাটার দফা নিকেশ করে দিয়ে আসি। ও ব্যাটাকে সাবড়াতে কতক্ষণ! ফুটপাতে একটি আছাড় মারলেই মুণ্ডুটি ছাতু হয়ে যাবে—"

প্রাণায়াম-সাধক পাঠকজি চটিলে আর রক্ষা নাই।

এ কথা সকলেই জানিতেন।

সুতরাং সকলেই নিঃশব্দে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন—কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না।

সভাপতি দিগিন্দ্র সোম মাথা-ঠাণ্ডা লোক।

তিনি একটু পরে একটু কাসিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন—

"পাঠকজির উত্তেজনার স্বাভাবিকতা আশা করি আপনারা কেহই অস্বীকার করেন না। তাঁহার এই উক্তি তাঁহার মত বীরের উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু পাঠকজির প্রস্তাবিত কার্য্যটা শুধু যে দুরূহ ও বিপজ্জনক তাহাই নয়—তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধনেশবাবুকে ক্ষমা করিতে চাই এবং সম্ভব হইলে দলে টানিতে চাই। আর যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন—"

ঐতিহাসিক কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শীর্ণকান্তি লোক। গলা খাঁকরি দিয়া তিনি বলিলেন—

"আমার দৃঢ় ধারণা, ধনেশবাবুর বায়ু প্রকুপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যদি কিছু করিতেই হয় তবে তাঁহার কবিরাজী মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি এখন রোগী। ধনাধিক্য হেতু বায়ু-বিকৃতির নজির—বলেন ত—ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি। রোমে নীরো, ইজিপ্টে ইখন্যাটান্, পারস্তে নাদির শাহ—"

সভাপতি মহাশয় দাঁ মহাশয়কে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—

"দাঁ মহাশয়ের প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে ইহা তাদৃশ কার্য্যকরী হইবে না—ধনেশবাবু কিছুতেই আমাদের অনুমোদিত উপায়ে চিকিৎসিত হইতে রাজী হইবেন না। সহজ অথচ কার্য্যকরী কোন পন্থা অবলম্বন করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি—

উস্‌কো-খুস্‌কো চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া হরিকুমার-শিষ্য সুকবি পঙ্কু মিত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মিহি গলায় বলিলেন—

"অনুমতি করেন ত ধনেশবাবুকে গদ্য কবিতায় চিঠি লিখতে পারি আমি একটা। সমালোচিকা তপতী দেবীর কথা যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে পাষাণ গলাবার ক্ষমতা আছে আমার ছন্দ-লক্ষ্মীর—"

বৈজ্ঞানিক প্রখরেশ পাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অধীর ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। "থামুন ত মশায় আপনি। বাজে ফক্কুড়ি করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে পরে। কাজের কথা হোক আগে। আমার ধারণা ধনেশ পোদ্দারকে ছলে অথবা কৌশলে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই। বলে তার সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। যাঁরাই জীবন-যুদ্ধের অর্থাৎ ষ্ট্রাগল ফর একজিস্‌টেন্সের রীতিনীতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করেছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবন-যুদ্ধে জয় লাভ করতে হলে ছল ও কৌশলও কম উপযোগী অস্ত্র নয়। ধনেশকে ছলে অথবা কৌশলে আয়ত্তে আনতে হবে।"

গল্প-লেখক মুরারিমোহন বলিলেন—

"গণেশবাবুকে ধরলে হয় না? বেশ ভাল লোক তিনি—"

প্রায় সমস্বরে সকলে প্রশ্ন করিলেন—"গণেশ কে?"

"ধনেশের বাবা।"

মুরারিবাবু বলিতে লাগিলেন—"গণেশবাবু চমৎকার লোক। আমার সঙ্গে আলাপও আছে। গণেশবাবু যদি অনুরোধ করেন, ধনেশ-তা অগ্রাহ্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না। ধনেশবাবু আর যাই হোন খুব পিতৃভক্ত শুনেছি—"

"তাই চলুন—গণেশবাবুকে ধরি গিয়ে সকলে মিলে—"

রুদ্ধ আবেগে দিগিন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বাকী সকলেও সোৎসাহে সম্মত হইয়া গেলেন!

হেবো কিছু বলিল না।

সে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

মুরারিবাবু ভুল জানিতেন।

সকল কথা জানিত হেবো।

কথাটি এই—ধনেশ পিতৃভক্ত ছিল না—গণেশই পুত্রভক্ত ছিলেন। কারণও ছিল।

বৃদ্ধ গণেশ তরুণী তৃতীয় পক্ষ ও বিগত দ্বিতীয় পক্ষের অনেকগুলি অপোগণ্ড কাচ্চাবাচ্চা লইয়া প্রথম পক্ষের পুত্র ধনেশের দাক্ষিণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। ধনেশ ঘাড় ধরিয়া বৃদ্ধ পিতাকে কাচ্চাবাচ্চা সমেত রাস্তায় বাহির করিয়া দেন নাই, ইহাই যদি পিতৃভক্তির নিদর্শন হয়—তাহা হইলে ধনেশ পিতৃভক্ত।

পিতার প্রতি ভক্তি থাকিবার ধনেশের কোন হেতুও ছিলনা।

এক জন্মদান করা ছাড়া গণেশ ধনেশের আর কোন উপকার করেন নাই। এই বিপুল ধন-সম্ভার ধনেশ উত্তরাধিকারসূত্রে পান নাই—নিজে উপার্জ্জন করিয়াছেন। গণেশ সামান্য চাকুরি করিতেন এবং স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে আজীবন তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, তিনি ধনেশকে লেখাপড়া পর্য্যন্ত শিখাইবার অবসর পান নাই। ধনেশ স্বকীয় প্রতিভাবলে পাট ও লোহার কারবার করিয়া বিগত যুদ্ধের বাজারে বহু টাকার মালিক হইয়া বসিয়াছেন।

তবে ইহা সত্য কথা, ধনেশ পিতার প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করে না। কিন্তু পিতৃভক্ত বলিতে যাহা বুঝায়, ধনেশ তাহা নয়।

পিতা গণেশ পুত্র ধনেশের আধিপত্যে দুই পক্ষ লইয়া গরুড় পক্ষীটির মত সসঙ্কোচে বাস করিয়া থাকেন।

এই গণেশকে গিয়া দিগিন্দ্রবাবুর দল গোপনে ধরিয়া পড়িলেন। গণেশ লোক খারাপ নন। এতগুলি ভদ্রসন্তানের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না। আশ্বাস দিলেন ধনেশকে তিনি অনুরোধ করিবেন।

করিলেনও।

শুনিবামাত্র ধনেশ বলিয়া বসিলেন—"ক্ষেপেছ ? এ সব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? তোমাকে এসে ধরেছিল বুঝি ! যত সব বোগাসের দল !"

গণেশ চুপ্ সাইয়া গেলেন।

সুতরাং পরদিন দিগিন্দ্রবাবুকেও চুপ্ সাইতে হইল।

এ রকমটা যে ঘটিবে হেবো তাহা জানিত।

দুই

আবার পরামর্শ-সভা বসিল।

গল্প-লেখক মুরারি মোহন আবার একটি পরামর্শ দিলেন এবং রাজনৈতিক দিগিন্দ্রবাবু আবার তাহাতে নাচিলেন। সুতরাং বাকী সকলকেও নাচিতে হইল।

"কঙ্করানন্দের কাছে যাওয়া যাক্।"

কঙ্করানন্দ ধনেশের গুরু।

কঙ্করানন্দকে ভিজাইতে পারিলে ধনেশ তাতিবেই।

গুরুবাক্য ধনেশ কিছুতেই ঠেলিতে পারিবে না।

সদলবলে গিয়া সকলে কঙ্করানন্দের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িলেন।

সমস্ত শুনিয়া কঙ্করানন্দ বলিলেন—"তোমাদের উদ্দেশ্য সাধু—ধনেশকে আমি অনুরোধ কোরব—"

সকলে আশ্বস্ত হইলেন।

এইবার নিশ্চয়!

হেবো কিন্তু হাসিল।

* * * *

হেবোর হাসি বিফল হইল না।

ধনেশ অটল।

গুরুবাক্য সে অবহেলা করিয়াছে, অথচ গুরু চটেন নাই!

ধনেশ-কঙ্করানন্দ-সংবাদ নিম্নলিখিত প্রকার।

সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া ধনেশ গুরুদেবকে বলিলেন—

"গুরুদেব, আপনার আদেশ আমি নতশিরে মানতে বাধ্য। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞেস করবার অনুমতি দিন আমাকে। এতগুলো টাকা কি আপনি জলে ফেলে দিতে আদেশ করেন? যদি করেন—দেব—জলেই ফেলে দেব আমি! আমার বিজ্‌নেস্‌ পার্টনার নাথমল স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাকে যে, মাসিক পত্র বার করলে টাকাটা ডাহা জলে পড়্‌বে! তা ছাড়া অতগুলো টাকা বাজে ব্যাপারে আটকে ফেল্‌তে ইচ্ছে নেই আমার। আমার আন্তরিক ইচ্ছে আপনাকে—"

স্মিতহাস্যভরে কঙ্করানন্দ বলিলেন—"আমার কিসের দরকার বল! আমি কাঁকর খাই, কাঁকরে শুই—"

"না—না, না—আপনার জন্যে নয়—সে স্পর্দ্ধা আমার নেই! আপনাকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রম স্থাপন করব বলে অনেক দিন থেকে আমার বাসনা।"

"তবে যা ভাল বোঝ—কর!"

সুতরাং কঙ্করানন্দকে ভিজাইয়াও বিশেষ সুবিধা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

রাত্রিকাল।

বাহিরের ঘরটাতে বসিয়া দিগিন্দ্রবাবু কানে কলমের উল্টা দিকটা ঢুকাইয়া বিকৃতমুখে কান চুলকাইতেছিলেন।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

আসিয়া বলিল—"দিগিন দা—জোগাড় করেছি—"

"কি ?"

"কান থেকে কলমটা বার করুন আগে।"

বেশ করিয়া একবার শেষ চুলকানী চুলকাইয়া লইয়া দিগিন্দ্র কলমটা কান হইতে বাহির করিলেন।

করিবামাত্র হেবো তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"ঠিকানা পেয়েছি। ধনেশও আজ কোলকাতার বাইরে গেছে। আজই সুযোগ, যাবেন এখন ?"

"এক্ষুনি।"

দুই

চিৎপুর অঞ্চলে একটি সুসজ্জিত কক্ষ।

মদিরাক্ষী একটি যুবতীর সম্মুখে দিগিন্দ্র কাঁচুমাচু হইয়া বসিয়া আছেন।

যুবতী হাসিয়া বলিলেন—"নিন্ পান খান একটা।"

"হ্যাঁ—এই যে—"

ত্রস্ত দিগিন্দ্র একটি পান তুলিয়া লইলেন।

"মাসিক পত্র আপনাদের বার করিয়ে দেবই—কথা দিলাম। নিশ্চয় দেব! কিন্তু তার বদলে আমাকে কি দেবেন বলুন!"

যুবতীর কৌতুকদীপ্ত নয়ন দুটিতে চাপা-হাসি ফুটি ফুটি করিতে লাগিল।

দিগিন্দ্র উত্তর দিবে কি! তাহার অবস্থা তখন শোচনীয়।

গরম দুধে পাঁউরুটি পড়িলে তাহার যেমন অবস্থা হয়—দিগিন্দ্রের অবস্থা তখন অনেকটা তাই—অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

আবদার-তরল কণ্ঠে যুবতী আবার বলিলেন—"আপনাদের কাগজে আমার ছবি ছাপিয়ে দিতে হবে কিন্তু—"

দিগিন্দ্র নিরুত্তর।

দিগিন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া হেবোই শেষে উত্তর দিল।

"নিশ্চয়—প্রত্যেক মাসেই আপনার ছবি থাকবে—"

তিন

বলা-বাহুল্য, ধনেশ পুরুষ মানুষ।

সুতরাং সে কাবু হইল।

শুধু কাবু নয়—ঢালা হুকুম দিল—যত টাকা লাগে—কুছ পরোয়া নেই। সুতরাং অলকনন্দা এইবার নির্ঘাৎ বাহির হইবে।

মহাসমারোহে আয়োজন চলিতেছে।

কয়েকজন উদীয়মান শিল্পী চিৎপুরে গিয়া ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছেন। হেবোর নির্দেশ অনুযায়ী অলকনন্দার প্রথম সংখ্যার প্রথম রঙীন ছবিটির নাম হইবে 'পূজারিণী'—দ্বিতীয় ছবিটির 'স্নানার্থিনী'। তৃতীয় ছবিটির নামকরণ হেবো এখনও করে নাই।

এক

এককড়ির প্রপৌত্র, দু'কড়ির পৌত্র, তিনকড়ির পুত্র বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার স্বীয় পুত্র ছ'কড়িকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরিণহাটি গ্রামে পাঁচকড়ি পোদ্দারকে সকলেই যথেষ্ট খাতির করিত। স্তত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন। সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। য কোন বিষয়ে—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সিনেমা, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা, পাটের দর, কয়লা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—যে-কোন বিষয়ে স্বকীয় মতবাদ যখন তিনি তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া জাহির করিতেন তখন হরিণহাটি গ্রামের সকলেই তাহা সানন্দে মানিয়া লইতেন এবং মানিয়া লইয়া নিজেদের ন্য জ্ঞান করিতেন।

অন্য উপায় ছিল না।

পাঁচকড়ি পোদ্দার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন এবং গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রায় সকলেই তাঁহার খাতক। সুতরাং হরিণহাটি গ্রামে সঙ্গীত, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দারের মতামতই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। ইহাতে যাঁহারা বিস্মিত বোধ করিতেছেন তাঁহাদের কিছুকাল হরিণহাটি গ্রামে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন জল না থাকিলে যেমন পুষ্করিণী অচল, পোদ্দার মহাশয় না থাকিলে হরিণহাটি গ্রামও তেমনি অচল। পোদ্দার মহাশয় তাঁহার সমস্ত ধনসম্ভার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করাতে সারা জীবনটা ভরিয়া নানা-প্রকার মতবাদ গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এই মতবাদগুলি

লইয়া যেখানে-সেখানে যখন-তখন আস্ফালন করিয়া বেড়ানোটাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিলাস ছিল। মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গল্পের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার যে-কোন প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধবাদী। এমন কি, তিনি বোতামের বদলে ফিতা ব্যবহার করেন। ফিতা-বাঁধা ফতুয়াই তাঁহার সাধারণ অঙ্গচ্ছদ। অদ্যাবধি কেহ তাঁহাকে জুতা পরিতে দেখে নাই। খড়মই চিরকাল তাঁহার চরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এ-হেন পাঁচকড়ি পোদ্দার-পুত্র ছ'কড়ির নিকট ঘা খাইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি মারা যাওয়ার পর হইতে আদর দিয়া দিয়া গৃহিণী ছ'কড়ির মাথাটি এমনভাবে খাইয়াছেন যে পুত্রটি মুণ্ডহীন কেতুর ন্যায় মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যখনই সে কালকাতায় পড়াশোনা করিতে যায় দূরদর্শী পোদ্দার মহাশয় তখনই আপত্তি করিয়াছিলেন। বি-এ, এম-এ, পাস করিয়া দশটা মুণ্ড, বিশটা হাত কিছুই গজাইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে গজাইবে—তাহাতেই বা কি? এই বাজারে অতগুলো বাড়তি হাত ও মুণ্ড লইয়া হইবে কি! কিন্তু গৃহিণী শুনিলেন না এবং মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে পড়িয়া তিনিও মত দিয়া ফেলিলেন—এখন নাও—ছেলে 'লভে' পড়িয়াছে!

দুই

ছেলে যে 'লভে' পড়িয়াছে এ-কথাটা প্রথমত পোদ্দার মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই। তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব কুণ্ডুর সাহায্য লইয়া তবে তিনি পুত্রের পত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইরূপ:

একদা পাঁচকড়ি পোদ্দার চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে ছ'কড়ির বয়স

াইশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ তাহার বিবাহ এখনও দেওয়া গেল না, হা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ছ'কড়ি লখাপড়ার অজুহাত উপস্থিত করে। কিন্তু পোদ্দার মহাশয় ভাবিয়া দখিলেন এবং মাধব কুণ্ডুও সে-কথা সমর্থন করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে ছ'কড়ি কিছুতেই বিবাহ করিবে না এবং এই যৌবনকালে বিবাহ না করিলে নানা প্রকার অঘটন ঘটিতে পারে—বিশেষতঃ কলিকাতার মত শহরে।

পোদ্দার মহাশয়ের স্বজাতি ও বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের মেয়েকেই তিনি ছ'কড়ির জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বেই বিশ্বনাথের াহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা গোপনে পাকা হইয়া আছে।

বিশ্বনাথ কলিকাতায় বেশ ফালাও ব্যবসা করেন, লোকও ভাল, পোদ্দার মহাশয়ের ভারি পছন্দ। তাছাড়া বাল্যবন্ধু। সর্ব্বোপরি বছর-চারেক পূর্ব্বে বিশ্বনাথ যখন দেশে আসিয়াছিল তখন তিনি তাহাকে এক রকম পাকা কথাই দিয়াছেন। সুতরাং ঐখানেই বিবাহ ঠিক। মাধব কুণ্ডুও এ বিষয়ে এক মত। পাকা কথা দেওয়ার পর হইতেই—অর্থাৎ প্রায় চার বৎসর ধরিয়া—পোদ্দার মহাশয় ও বিশ্বনাথের পত্রযোগে বিবাহ-সম্বন্ধীয় নানারূপ আলাপ-আলোচনাও চলিতেছিল। পোদ্দার মহাশয় ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিশ্বনাথকে প্রায়ই লিখিতেন—

“দেখিও ভায়া, মেয়েটিকে যেন ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। ইস্কুলে-পড়া হাল-ফেশিয়ান মেয়েদের কাণ্ড-কারখানার কথা শুনিলে গায়ে জ্বর আসে। বউমাটিকে গৃহকর্ম্মনিপুণা কর। আমার সহধর্ম্মিণী এখনও ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারেন এবং দশটা যজ্ঞির রান্না একাই রাঁধিতে পারেন। তাঁহার দেওয়া বড়ি ও আমসত্ত্ব গ্রামসুদ্ধ লোক খাইয়া প্রশংসা করেন। দেখিও ভায়া, বউমাটি যেন এই চাল বজায় রাখিতে পারে—”

উত্তরে বিশ্বনাথ লিখিতেন—

"ভায়া, তুমি মোটেই চিন্তিত হইও না। মেয়েকে সংসারধর্ম্মে সুনিপুণ করিতে-আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। তোমার বউমা মশলা বাটা কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম নিয়মিতভাবে করিয়া থাকে। সম্প্রতি সে উল-বোনা ও জরির কার্য্য করিতেও শিখিয়াছে। সেদিন সে একটি রেশমের কাপড়ে রঙীন সুতা দিয়া এমন সুন্দর একটি হংস আঁকিয়াছে যে দেখিলে সত্যই অবাক হইতে হয়—"

ইহার উত্তরে পোদ্দার মহাশয় জবাব দিতেন—

"উল-বোনা জরির কার্য্য সাধারণ গৃহস্থালীর কোন প্রয়োজনে আসে না। রেশম বস্ত্রে অঙ্কিত রঙীন হংসই বা এমন কি উপকারে আসিবে বুঝি না। তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তোমাকে পুনঃ পুনঃ আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি, বউমাটিকে ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। কালের গতিক সুবিধার নহে। মাধব কুণ্ডু খবরের কাগজ পড়িয়া আজকালকার হালচাল সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করে তাহাতে আমাদের মত মূর্খ লোকের আক্কেল গুড়ুম্ হইয়া যায়—"

ফেরত ডাকেই বিশ্বনাথের জবাব আসিত—

"উল-বোনা ও জরির কার্য্য বন্ধ করিলাম। রেশম বস্ত্রে কোন প্রকার চিত্রাদিও আর আঁকা হইবে না—"

এইভাবে চারি বৎসর চলিতেছিল।

ছ'কড়ি বিন্দুবিসর্গ জানে না।

সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়াশোনা করে। বিবাহের কথা উঠিলে বলে যে পড়াশোনা শেষ করিয়া তবে বিবাহ করিবে—তৎপূর্ব্বে নয়।

কিন্তু মাধব কুণ্ডুর পরামর্শ অনুযায়ী পোদ্দার মহাশয় ঠিক করিলেন যে, জোর করিয়া বিবাহ না দিলে স্বেচ্ছায় ছ'কড়ি বিবাহ করিবে না। আজকালের ছেলেছোকরাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের। এই প্রসঙ্গে মাধব কুণ্ডু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষগুলি লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলেন।

পরদিনই পোদ্দার মহাশয় মাধব কুণ্ডুর নির্দ্দেশমত ছ'কড়িকে পত্র দিলেন যে আগামী মাসের ১৭ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, সে যেন অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া আসে।

তিন

ইহার উত্তরে ছ'কড়ি যাহা লিখিল তাহাতে পাঁচকড়ি আকাশ হইতে পড়িলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যে এতদূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। তিনি অবিলম্বে মাধব কুণ্ডুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কি করিয়া এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না।

ছ'কড়ি লিখিয়াছে—

"বাবা, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছি। আপনাকে এ-কথা জানাই নাই তাহার কারণ আপনি স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে। ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি অভয় দেন আমরা উভয়ে গিয়া আপনাদের প্রণাম করিয়া আসিব ও সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

কুণ্ডু আসিলে পত্রটি তাহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "ছ'কড়ির চিঠি! পড়ে দেখ—এর মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পোদ্দার-বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মায়!"

কুণ্ডু নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "লভে পড়েছে—"

"কিসে পড়েছে?"

"লভে—লভে—মানে প্রেমে—"

পোদ্দার মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "এর মূলে কি আছে জান?"

কুণ্ডু বলিলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষা—"

"না, আমার গিন্নি। ওরই পরামর্শে আমি ছেলেটাকে কলকাতায় পড়তে পাঠাই—দাও চিঠিখানা—"

পোদ্দার পত্রখানি লইয়া খড়ম চট্‌চট্‌ করিতে করিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর সহিত তাঁহার যে বচনবিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

পরদিন আর এক কাণ্ড ঘটিল এবং তাহার ফলে পোদ্দার মহাশয়কে হরিণহাটি ত্যাগ করিতে হইল। কাণ্ডটি এই—বিশ্বনাথেরও একটি পত্র আসিল। তিনি পরদিন আসিতেছেন।

দিশাহারা পোদ্দার মাধব কুণ্ডুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে বিশ্বনাথের নিকট তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে হরিণহাটিতে আত্মগোপন করা আরও শক্ত। কুণ্ডু বলিলেন, "চলুন না, এই সময় বৃন্দাবনের তীর্থটা সেরে আশা যাক। এক ঢিলে দুই পাখীই মরবে"—পাঁচকড়ি পোদ্দার তীর্থযাত্রা করিলেন। কুণ্ডু সঙ্গী।

চার

দীর্ঘ ছয় মাস পোদ্দার মহাশয় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুণ্ডু সঙ্গে থাকাতে ভ্রমণটা মনোরমই হইল। ফিরিবার পথে কাশীতে তিনি বিশ্বনাথের এক পত্র পাইলেন। বিশ্বনাথ লিখিতেছেন—

“ভায়া, হরিণহাটিতে গিয়া তোমার নাগাল পাই নাই। তুমি বাড়ীতে কোন ঠিকানাও রাখিয়া যাও নাই যে তোমাকে চিঠি লিখি। সম্প্রতি শুনিলাম তুমি নাকি কাশীতে আছ এবং সেখানে কিছুদিন থাকিবার বাসনা করিয়াছ এবং এই মর্ম্মে হরিণহাটিতে কুণ্ডু মহাশয় একখানি পত্রও না-কি লিখিয়াছেন। সেই পত্র হইতে তোমার ঠিকানা জোগাড় করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার সময় পায় নাই। এখন অকপটে সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি এবং তোমার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

“তুমি স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী বলিয়া তোমাকে আমি জানাই নাই যে আমার মেয়েকে আমি স্কুলে পড়াইতেছিলাম! ভাবিয়াছিলাম তোমার সহিত দেখা হইলে জিনিসটা ধীরেসুস্থে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। আমি নিজে বিশ্বাস করি লেখাপড়া শেখা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে নিন্দার কিছু থাকিতে পারে না।

“শ্রীমান ছ'কড়ি কলিকাতায় থাকিতে আমার বাসায় প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং কুসুমের সহিত তাহার বেশ ভাবও হইয়াছিল। কুসুম ভবিষ্যতে তাহার পত্নী হইবে ভাবিয়া আমিও তার মেলামেশায় কোন বাধা দিই নাই। কিন্তু একদিন আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যে মেলামেশাটা একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে—বিবাহ না দিলে আর ভাল দেখায় না। শ্রীমান ছ'কড়িকে আমি সে-কথা একদিন স্পষ্টই

বলিলাম। তাহাতে সে বলিল যে সে অবিলম্বে কুসুমকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত এবং ইহাও সে বলিল যে তুমি যদি জানিতে পার যে মেয়ে স্কুলে গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে তাহা হইলে কুণ্ডু মহাশয়ের প্ররোচনায় পড়িয়া তুমি কিছুতেই বিবাহ ঘটিতে দিবে না। তোমাকে ত আমিও চিনি। তুমি একগুঁয়ে লোক—হয়ত বাঁকিয়া বসিবে। নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমাকে গোপন করিয়াই আমি কুসুমকে শ্রীমান ছ'কড়ির হস্তে সমর্পণ করিলাম। ছয় মাস নির্ব্বিঘ্নেই কাটিল। তাহার পর যখন তুমি ছ'কড়িকে পত্র লিখিলে যে তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে এবং ছ'কড়ি যখন তোমাকে জানাইল যে সে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে তখন আমি ভাবিয়া দেখিলাম এবার সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে খুলিয়া জানানো দরকার। সেই উদ্দেশ্যে আমি হরিণহাটিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম তুমি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছ।

"সমস্ত কথাই তোমাকে লিখিলাম। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমাকে ক্ষমা করা যদি তোমার পক্ষে নিতান্তই শক্ত হয়, আমাকে না হয় দু ঘা মারিয়া যাও। কিন্তু ছেলে-বউকে অবহেলা করিও না। কুসুম স্কুলে পড়িলেও সত্যই গৃহকর্ম্মনিপুণা হইয়াছে। নিজে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার…" ইত্যাদি।

পাঁচ

বহুদিন পরে পোদ্দার মহাশয় হরিণহাটিতে প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গ্রামের কয়েকটি ছোকরা বাটারফ্লাই ফ্যাশানে গোঁপ ছাঁটিয়াছে এবং মল্লিক বাড়ীর বৈঠকখানার বারান্দায় বিলাতী মরশুমী ফুলের কয়েকটি

টবও বসান হইয়াছে। পোদ্দার মহাশয় কিছু না বলিয়া কুণ্ডুর মুখের দিকে শুধু একবার চাহিলেন।

কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, “সব লক্ষ্য করছি—”

* * * *

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোদ্দার মহাশয় দেখিলেন যে তাঁহার গৃহিণী একটি সুন্দরীর বেণী রচনা করিতেছেন। বৌ!

পোদ্দারকে দেখিয়া পোদ্দার-গৃহিণী অসম্বৃত বেশবাস সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বধূ ছুটিয়া গৃহমধ্যে আশ্রয় লইল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, “হঠাৎ খবরটবর না দিয়ে এসে পড়লে যে। যাক্—এলে বাঁচলাম। ভাল ছিলে ত বেশ?”

পোদ্দার মহাশয় এ-সব প্রশ্নের জবাব না দিয়া অদূরে টাঙানো দোলনাটি দেখাইয়া বলিলেন, “ওটা কি?”

“ওমা, ছ'কড়ির খোকা হয়েছে যে! অমলকুমার—”

“কি?”

“অমলকুমার! বৌমা ছেলের নাম রেখেছে অমলকুমার।”

পোদ্দার স্তম্ভিত।

বিস্ময় কাটিলে তিনি বলিলেন, “অমলকুমারকে নিয়ে থাক তোমরা। আমি কাশী ফিরে চললাম—”

বলিয়া তিনি সত্যই ফিরিলেন।

পথরোধ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, “ওমা, সে কি কথা গো—”

“অমলকুমার নাম আমি বরদাস্ত করতে পারব না—”

“বেশ ত তুমিই একটা নাম দাও না।”

“ন'কড়ি—”

“বেশ তাই হবে—”

পোদ্দার মহাশয় ঘুরিয়া দোলনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাস্তব ও স্বপ্ন

আদেশ শুনিয়া পলাশ অবাক হইয়া গেল।

তাহার পর যথোচিত সংযত কণ্ঠে কহিল—"তা কি করে সম্ভব?"

বড়বাবু রুক্ষ স্বরে উত্তর দিলেন—"সম্ভব অসম্ভব বুঝি না মশাই, কাল ন'টার মধ্যে আপনাকে লেজার কমপ্লিট করে দিতে হবে। দশটার সময় ইনেস্‌পেকশন হবে—"

পলাশ আবার বলিল—"সমস্ত লেজারটা কমপ্লিট করতে হলে ত সমস্ত রাত কেটে যাবে। আমি কি সমস্ত রাত এইখানে বসে কাজ করব?"

"সমস্ত রাত! দশটা পর্য্যন্ত কাজ করলে অমন দুটো লেজার কমপ্লিট হয়ে যায়। এখন ত মাত্র আড়াইটে বেজেছে। সাত আট ঘণ্টা ভাল করে কাজ করলে লেজার কমপ্লিট হবে না? কাকে শেখাচ্ছেন আপনি! আমিও একদিন আপনার পোষ্টেই চাকরি করেছি।

"বাড়ীতে আমার ছোট মেয়েটির জ্বর দেখে এসেছিলাম—অত রাত্রি পর্য্যন্ত আফিসে থাকলে—"

পলাশ তাহার কথা শেষ করিতে পারিল না। বড়বাবু তাঁহার 'রিভলভিং' চেয়ারখানাতে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া পলাশের মুখের দিকে সোজা তাকাইয়া কঠিন স্বরে বলিলেন—"দেখুন এই জন্তেই আমি সাহেবকে বলেছিলাম যে, এম্-এস্-সি ফেমেস্‌সি ক্লার্ক আমার দরকার নেই! ওরা 'ষ্টিক' করে থাকবেনও না, আর যতদিন থাকবেন ততদিন কাজকর্ম্ম না করে খালি তর্ক করবেন। আপনার ছোট মেয়েটীর জ্বর হয়েছে বলে কি আমরা আপিস বন্ধ করে দেব নাকি? আমার

বাড়ীতেও ছুটো ছেলের হুপিং কাসি, একটির চোখ উঠেছে, পিসিমার হাঁপানি, গিন্নির কোমরে ফিক্ ব্যথা—তাই বলে কি আমি ঘরে বসে বুক চাপড়াব ? না, বুক চাপড়াইলেই কিছু উপশম হবে ?"

পলাশ বলিল—"কিন্তু এত কাজ যে 'এরিয়র' পড়েছে তা ত ঠিক আমার দোষে নয়। আমি যতদিন থেকে—"

উত্তপ্ত তৈলে এইবার বার্ত্তাকু নিক্ষিপ্ত হইল।

বড়বাবু টেবিল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—
"I order you to do it. You shall suffer if you do not obey. Go—"

পলাশ চলিয়া যাইতে যাইতে শুনিল, বড়বাবু প্রাকৃত ভাষায় স্বগতোক্তি করিতেছেন—"আরে মোলো—কচু খেলে যা—"

বড়বাবুর মুখটি লম্বা ধরণের—অনেকটা মোচার ন্যায়। থুৎনীর কাছে এবং মাথার দিকে একটু স্থচালো। মস্তক কেশবিহীন। সামনের দিকটাতে এত টাক পড়িয়াছে যে আলো পড়িলে চক্ চক্ করে চক্ষু ছুইটি বড় বড় এবং অস্বাভাবিক রকম শাদা। গায়ের বর্ণ ঘোর কালো হওয়ায় আরও শাদা দেখায়। মুখে গোঁফ দাড়ি নাই, পরিষ্কার কামানো। বলা বাহুল্য বড়বাবুর দেহ-সৌষ্ঠবে নয়নমুগ্ধকর কিছু নাই। তাহাতে অবশ্য কিছু ক্ষতি হয় নাই। কারণ তিনি কোন প্রণয়-ব্যাপারে নায়ক-পদপ্রার্থী নহেন। জীবনে তিনি যাহা কামনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি এই বদ চেহারা এবং স্বল্প বিদ্যা সত্ত্বেও পাইয়াছেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এত বড় আপিসের বড়বাবুর পদে উন্নীত হওয়া কি সোজা কথা ?

দুই

বড়বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাশ দেখিল যে, বড়বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন কৌতূহলী কেরাণী বড়বাবুর দ্বারের কাছে উৎকর্ণ হইয়া আড়ি পাতিয়াছে। পলাশকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহারা বুঝিল যে, শ্রবণযোগ্য আর কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। পলাশও আসিয়া নিজের স্থানটিতে বসিল। তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। এত অপমানিত সে জীবনে কখনও হয় নাই। ছি, ছি—মাসে চল্লিশটা টাকার জন্য এই লাঞ্ছনা! একটু পরেই একটি সুদর্শন ছোকরা আসিয়া পাশের টুলটা টানিয়া বসিল এবং এক টিপ নস্য টানিয়া হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বললে হুঁকো-মুখো?"

অফিসে সকলেই বড়বাবুকে আড়ালে হুঁকো-মুখো বলিয়া ডাকিত। পলাশ কিছুক্ষণ কোন উত্তরই দিল না।

অমিয় বলিল—"কি বললে—বল না?"

অমিয় পলাশের বন্ধু। এককালে সহপাঠী ছিল।

পলাশ বলিল—"বললে এই লেজার বুক কমপ্লিট করে দিতে"—পলাশ এক বিরাটকায় খাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

অমিয় বলিল—"এখন বলবে বৈকি। কাল 'অডিট' আসছে কি না। তোমার পোষ্টে ওর শালা এতকাল ছিল। কুটোটি নাড়ত না—তাই এতসব বাকী—"

পলাশ নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

অমিয় সহানুভূতির স্বরে বলিল—"এখন আর ভেবে কি হবে ভাই। উঠে পড়ে লেগে যাওয়াই ভাল। বল ত তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার ফাইল আমি ক্লিয়ার করে ফেলেছি—"

এমন সময় চশমা সামলাইতে সামলাইতে বিশ্বাস মশায় প্রবেশ করিলেন। স্ফীতোদর বর্ত্তুলাকার ভদ্রলোক। মাথায় অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুল; হাসিলে কালো পানের ছোপধরা কয়েকটি দন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই অফিসের অনেককালের কর্ম্মচারী। অফিসের সকলের সহিত তাঁহার দাদামহাশয় সম্পর্ক; তাঁহার সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা সকলেই করে। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করাতে রসিকতার মাত্রাটা সম্প্রতি একটু বাড়িয়াছে।

বিশ্বাস মশায় আসিয়া পলাশের দিকে তাকাইয়া অভিভাবক-ভঙ্গীতে বলিলেন—"ছি, ছি, কাজটা তোমার অন্যায় হয়েছে ভাই, বড়বাবুর মুখের উপর অমন জবাব দেওয়াটা তোমার উচিত হয়নি; হাজার হোক প্রবীণ লোক—তা ছাড়া শিবতুল্য মানুষ—" বলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি নিম্নস্বরে গল্প জুড়িয়া দিলেন—"আমাদের আফিসে আমরা ত সুখে আছি হে, রাম রাজত্বে আছি বললেই চলে। ওই আমাদের সামনের আপিসের বড়বাবুর তুলনায় আমাদের বড়বাবু ত' সাক্ষাৎ শিব। ওদের বড়বাবু রেগে গেলে জুতো পর্য্যন্ত ছোঁড়েন।"

একবার গল্প সুরু করিলে বিশ্বাস মহাশয়ের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। সত্যের বড় বড় নদী পর্ব্বত তিনি অনায়াসে মিথ্যা কল্পনার এরোপ্লেনে উড়িয়া পার হইয়া যান। এ ক্ষমতা তাঁহার আছে সুতরাং তিনি তাঁহার শ্লথ চশমাটা নাকের উপর ঠিকমত বসাইয়া লইয়া সুরু করিলেন—

"সেকালে শুনেছি পালা করে বড়বাবুদের পা টিপে দিতে হত—তামাক সেজে দিতে হত। তবে চাকুরি বজায় থাকত। শঙ্কর খুড়োর

মুখে গল্প শুনেছি—একবার তাঁর আপিসের বড়বাবুর হ'ল 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়া'। ডাক্তার উপদেশ দিলেন, গন্ধভাদালের সঙ্গে চুনো মাছের ঝোল করে খেতে। তাই শুনে শঙ্কর খুড়ো সকালে উঠে নিজেদের খিড়কির পুকুর থেকে স্বহস্তে জাল ফেলে চুনো মাছ ধরে আর এক বোঝা গন্ধ-ভাদালের লতা সংগ্রহ করে নিয়ে আপিসে হাজির হলেন। আপিসে গিয়েই কিন্তু শঙ্কর খুড়োর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। গিয়ে দেখেন, সেখানে ইতিমধ্যে প্রায় মণ খানেক চুনো মাছ আর গাড়ী খানেক গন্ধ-ভাদালের লতা এসে পৌঁছে গেছে, দুর্গন্ধে আফিসে টেকা মুস্কিল, সায়েব চটে লাল—"

অমিয় হাসিয়া করজোড়ে বলিল—"বিশ্বাস দা—ঢের হয়েছে। এইবার একটু দয়া করুন। এই বিরাট লেজার কমপ্লিট করতে হবে।"

বিশ্বাস মহাশয় একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"এতে আর দয়া করা-করি কি ভাই। তোমরা হিতকথা বললে ত আর শুনবে না। তোমাদের মেজাজ 'তেরিয়া' হয়েই আছে। মাথা ঠিক রেখে কথাটা পর্য্যন্ত কইতে পার না। বাঙালীর ছেলে চাকরিটি গেলে তখন খাবে কি ?" বলিয়া তিনি মাথা ঝাঁকিয়া পলাশের দিকে তাকাইয়া তাঁহার পতনোন্মুখ চশমাটা আবার নাকের উপর বসাইয়া দিলেন তাহার পর চোখের ইসারায় পলাশকে ডাকিয়া বলিলেন—"একটা কথা বলছি শোন—প্রাইভেটলি—"

পলাশ উঠিয়া গেল। বারান্দায় গিয়া বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—"বড়বাবু চলে যাওয়ার আগে একবার গিয়ে 'অ্যাপলজি' চেয়ে এসো।"

"অ্যাপলজি ? কেন ?"

ইহার বেশী আর পলাশ বলিতে পারিল না। সে এই অল্পদিন হইল চাকুরিতে ঢুকিয়াছে, এখনও তাহার গায়ে ইউনিভার্সিটির গন্ধ লাগিয়া

আছে; এই সদাগরি আপিসের রীতি-নীতি এখনও সে ঠিক মত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিশ্বাস মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"এখনও 'টেমপোরারি' লিষ্টে রয়েছে বুঝছ না? বড়বাবুর কলমের এক খোঁচায় তোমার চাকরিটি খতম হয়ে যেতে পারে, ওঁর ছোট শালা মুকিয়ে রয়েছে, তোমাকে ত উনি নিতেই চাননি প্রথমে। এম্-এস্-সি পাশ ব'লে ঘোর আপত্তি করেছিলেন। তোমার শ্বশুর হেরম্ববাবুর সঙ্গে 'টমলিন্সন্' সাহেবের অত্যন্ত দহরম মহরম, তারই জোরে তুমি চাকরিটি পেয়েছ; তুচ্ছ একটা কথার জন্যে খুইয়ো না। বড়বাবুকে বল যে, 'আমায় মাপ করুন—এমন আর কখনো হবে না।' সব ঠিক হয়ে যাবে—এধারে শিবতুল্য লোক উনি!" দ্বারপ্রান্তে অমিয় দেখা দিল, অমিয়কে দেখিয়া বিশ্বাস মহাশয় শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ যাও—কাজ করোগে তোমরা, আমার কাজ হয়নি এখনও। ওরে এক পয়সার মিঠে পান বোঁ করে নিয়ে আয় ত বাবা", বলিয়া তিনি একটি পয়সা একটি পাংখা কুলিকে দিলেন। যাইবার সময় তাহাকে বলিলেন—"একটু দোক্তাও আনিস্—ওই মোড়ের দোকানটা থেকে নিস্—বেড়ে দোক্তা মাগীর—"

বিশ্বাস মহাশয় চলিয়া গেলেন।

অমিয় এবং পলাশ আসিয়া লেজার লইয়া পড়িলেন।

তিন

রাত্রে পলাশ বাড়ী ফিরিতেছে।

দশটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গলিটার মুখে দাঁড়াইয়া পলাশ খানিকক্ষণ কি ভাবিল। এই দুর্গন্ধ গলিটার এক প্রান্তে

সে তাহার সাধের সংসার পাতিয়াছে! মেয়েটা কেমন আছে কে জানে! নানা আবর্জ্জনা পার হইয়া সে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল; স্ত্রী হেমাঙ্গিনী আসিয়া দ্বার খুলিল এবং প্রশ্ন করিল—"আজ ফিরতে এত রাত হল?"

"আপিসে আজ কাজ বেশী ছিল—"

বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া হেমাঙ্গিনী আবার প্রশ্ন করিল—"আপিসে তোমাদের ফুলবাগান আছে নাকি?"

"তার মানে?"

"ফুল কোথায় পেলে?"

"কই? ও—ভুলেই গেছলাম! খুকী কেমন আছে?" বলিয়া কোটের 'বাটন হোল' হইতে একটি ক্ষুদ্র যুথিকাগুচ্ছ খুলিতে খুলিতে বলিল—"নাও তুমি খোঁপায় পর, ময়লা কোটে এসব মানায় না। অমিয়র বউ দিলে।"

"অমিয়র বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি?"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ অনুভব করিয়া জবাবদিহির সুরে পলাশ বলিতে লাগিল—"মানে, অমিয়ও এতক্ষণ আপিসে আমার সঙ্গে সমানে ছিল কি না। আমার কাজের সাহায্য করছিল। আজ তার ভায়রা ভাই এসেছে—বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার একটু আয়োজন ছিল—আমাকে নেমন্তন্ন করলে—'না' বলতে পারলাম না; অমিয় না থাকিলে আজ লেজার কমপ্লিট করা অসম্ভব হত। খুকী কেমন আছে?"

"খাওয়া-দাওয়া ওদের বাড়ীতে সেরেই এসেছ তাহলে?"

"হ্যাঁ—খুকীটা কেমন আছে—?"

"রাত্রে ওখানে শুলেও পারতে! আসবার দরকার কি ছিল! খুকীর জন্যে ত তোমার ঘুম হচ্ছে না। ভারি এক ব্যাগারি হরেন ডাক্তার জুটেছে—সন্ধ্যেবেলা এসে পনর ষোল টাকার ইন্‌জেক্‌শেনের ফরমাস করে গেছেন। এদিকে মেয়ের দুধ পর্য্যন্ত পেটে যাচ্ছে না—নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে—"

ঝনাৎ করিয়া সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী সরিয়া দাঁড়াইল। পলাশ বুঝিল এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলে পাশের বাড়ীর লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইবে মাত্র। নীরবে ঘরে ঢুকিল। চোখে পড়িল তাহার 'ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস্'খানা দিয়া একটা বাটিতে কি ঢাকা রহিয়াছে। বোধ হয় সাবু কিংবা বার্লি। নিকটে একখানা চিঠিও রহিয়াছে, দেখিল হরেন ডাক্তার লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। চিঠি পড়িয়া পলাশের গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল! মেয়ের ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে, আজ রাত্রেই ইন্‌জেক্‌শন্ না দিলে জীবন সংশয়। সর্ব্বনাশ, ইন্‌জেক্‌শন্ কিনিবার মত টাকাও যে তাহার হাতে এখন নাই! অথচ—

ঘর হইতে বাহির হইয়া সে দেখিল হেমাঙ্গিনী খাইতে বসিয়াছেন। বাঙালী ঘরের অধিকাংশ সাধ্বী স্ত্রীগণের আদর্শ-অনুযায়ী হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ স্বামীর প্রত্যাশায় অভুক্তা ছিলেন এবং স্বামীর বিলম্বহেতু মনে মনে চটিতেছিলেন।

স্বামী বন্ধুর বাড়ীতে আহারাদি সমাপনান্তে যুবতী বন্ধু-পত্নীর নিকট হইতে পুষ্পগুচ্ছ উপহার পাইয়াছেন দেখিয়া হেমাঙ্গিনী উক্ত সাধ্বী স্ত্রীগণের অনুকরণে ক্লান্ত স্বামীকে কটূক্তি বর্ষণান্তে কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত লইয়া খাইতে বসিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনীর দোদুল্যমান দুল দুইটির প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া পলাশ ভাবিতে লাগিল—"শেষ পর্য্যন্ত কি—"

চার

কল্পনাপ্রবণ পলাশকান্তির যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন বেলা পাঁচটা। নিদ্রাভঙ্গ হইলেও স্বপ্ন ভঙ্গ হইতে চায় না। অত্যন্ত দীর্ঘ স্বপ্ন দেখিয়াছে সে! তাহার মনে হইতে লাগিল কুপিতা হেমাঙ্গিনী আশে পাশে কোথাও ঘুরিতেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিল যে সে তাহার সেই পুরাতন মেসের সনাতন জারুল কাঠের চৌকিতেই শুইয়া আছে। সমস্তটাই স্বপ্ন! আঃ বাঁচা গেল।

সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল; 'শেল্‌ফ' হইতে হেমাঙ্গিনীর 'ফোটো'খানা লইয়া আর একবার ভাল করিয়া দেখিল। দেখিতে মন্দ নয় মেয়েটি। তবু ও খপ্পরে আর সে পা দিবে না।

এমন সময় হেরম্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র পলাশ 'ফোটো'খানি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল—"আমি ভেবে দেখলাম ভাল একটা রোজগারের জোগাড় না করে এখন বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না!"

হেরম্ববাবু হাসিয়া বলিলেন—"চাকরি ত আমি জোগাড় করে রেখেছি তোমার জন্যে। টমলিন্‌সন্ সায়েব আমাকে প্রমিস্ করে রেখেছেন। তোমার বন্ধু অমিয় বাবু, তোমাদের এই মেসেই থাকেন বিশ্বেস মশাই, এঁদের আপিসেই তোমার ভাল একটা চাকরি জোগাড় করে দেব। প্রথমেই চল্লিশ টাকা থেকে—"

পলাশ সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে না—অত কম মাইনেতে আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব না। দেখি যদি একটা প্রোফেসারি জোটাতে পারি। বি, সি, এস্‌টা দেবারও চেষ্টা করব—"

ক্ষুণ্ণ হেরম্ববাবু বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ধারণা হইল ফটোগ্রাফারটা ঠিক ফটো লইতে পারে নাই। 'পোজ'টা ঠিক হয় নাই।

পাঁচ

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পলাশ এবং অমিয় একটি 'সিনেমা শো'তে যাইতে যাইতে গল্প করিতেছিল। বিশ্বাস মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিনেমা দেখা নয়, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে একটি মনোহারিণী শাড়ি কিনিয়া দিবার উদ্দেশ্যে পলাশ এবং অমিয়ের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাদের পছন্দের উপর বিশ্বাস মহাশয়ের অগাধ বিশ্বাস।

অমিয় বলিতেছিল—"স্বপ্নে নিজের সংসারটা কেমন দেখলি ?"

"ঠিক দাদা-বৌদির সংসার যেমন !"

"আর আপিস কেমন লাগল ?"

"আপিসে, তুমি, বিশ্বাস মশায় আর তোমাদের হুঁকো-মুখো ! বিরাট এক লেজার বুক !"

অমিয় হাসিয়া উঠিল।

"একটু দাঁড়াও ভায়ারা" বলিয়া বিশ্বাস মহাশয় মোড়ের একটি পানওয়ালির নিকট পান খরিদ করিতে গেলেন।

অমিয় বলিতে লাগিল—“আচ্ছা গাধা ত তুই। একটা স্বপ্ন দেখে অমন একটা দাঁও ছেড়ে দিলি? অমন সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরিও। কার ভাগ্যে জোটে অমন!”

বিশ্বাস মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া কথাবার্ত্তার সূত্র ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—“ঠিক করলে না দাদা! বাজার বড় খারাপ। তাছাড়া স্বপ্নে তুমি যাই দেখ আমাদের আপিসে কাজ করে সুখ পেতে! বড়বাবু আমাদের শিবতুল্য লোক!—ও কি তোমরা ওদিকে বেঁকলে যে! আমার শাড়িটা—”

হাত ঘড়িটা দেখাইয়া অমিয় বলিল—“মাত্র দশ মিনিট সময় আছে আর। কাল নিশ্চয় কিনে দেব। আপনি আজ আটটার পর যাবেন কিন্তু—”

ছয়

আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গী। নানাবর্ণের সুদৃশ্য মোটরকার হইতে নানাবিধ মূল্যবান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত নানা জাতীয় মানব-মানবী অবতরণ করিতেছে। আনন্দের স্বপ্নলোক এই মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়া পলাশ ত্বরিতপদে টিকিট কিনিতে গেল এবং সেইদিন সকালেই দাদার নিকট হইতে মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত দশ টাকার নোটখানা ভাঙাইয়া দুইখানি টিকিট কিনিয়া ফেলিল। ফিরিবার মুখে টিকিট ঘরের প্রতি ধাবমান একটি লোকের সহিত অন্যমনস্ক পলাশের ধাক্কা লাগিয়া গেল, পলাশ মুখ তুলিয়া দেখিল। লোকটি আর কেহ নয়, কন্যাদায়গ্রস্ত হেরম্ববাবু। তিনিও স্বপ্নাতুর!

খড়মের দৌরাত্ম্য

এক

ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, দশ-আনা ছ-আনা চুল, পরনে বিচিত্র লুঙ্গি, মুখে সর্ব্বদা পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ—এ হেন লোকের নাম রাধাবল্লব। পিতামহপ্রদত্ত নাম। রাশিয়ায় শুনিয়াছি নাম বদলাবার সুযোগ আছে। এদেশেও অনেক ছাত্রছাত্রী নাকি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে নিজেদের পছন্দসই নামকরণ করিয়া থাকেন। রাধাবল্লভ একবার ম্যাট্রিক দিবার সুযোগ অবশ্য পাইয়াছিল, কিন্তু নাম বদলাইবার কথাটা তাহার মনেই হয় নাই। পৃথিবীতে এই সব অঘটন কেন ঘটে তাহা বলা শক্ত। সে দুরূহ গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে রাধাবল্লভের নামটা আরও একটু আধুনিক হইলে যেন মানাইত ভাল। কারণ রাধাবল্লভ সত্যই একজন আধুনিক যুবক। চিন্তায়, পোষাকে, কথায়-বার্ত্তায়, বিশেষ করিয়া উপার্জ্জন ব্যাপারে রাধাবল্লভ একেবারে অতি-আধুনিক। 'ব্রিজ' এবং 'ফ্লাশ' খেলায় সুদক্ষ। এই পথে তাহার অর্থাগমও হয়। হয় বলিয়া রাধাবল্লভের মাতুল রাধাবল্লভের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ সিগারেট সিনেমার খরচটা আর তাঁহাকে জোগাইতে হয় না। এই বাজারে তাহাও কম লাভজনক নয়।

দুই

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করিবার পর হইতে রাধাবল্লভ তারুণ্য-চর্চ্চা করিতেছে। তারুণ্য-চর্চ্চা বলিতে কি বুঝায় তাহা এ যুগের পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বুঝেন। বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। নিরঙ্কুশভাবে তাহার তারুণ্য-চর্চ্চা চলিতেছিল। হটাৎ একদিন বেচারা ঘা খাইয়া গেল।

মহাদেব-ঘায়েল-কারী দুষ্ট দেবতাটি হঠাৎ একদা রাধাবল্লভ

পোদ্দারকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অব্যর্থ শর-সন্ধান করিলেন। মদনাহত মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহা সুবিদিত। মদনাহত রাধাবল্লভ পোদ্দার কি করিয়াছিল তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। আমি জানি। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বেচারা ধারে খানিকটা 'স্নো' কিনিয়া ফেলিয়াছিল। আয়না, স্নো এবং রাধাবল্লভ যখন পরস্পর পরস্পরে নিমজ্জিত তখন কিন্তু পিতামহ প্রজাপতি যে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে পায়ের খড়ম খুলিতে লাগিলেন আবেগ-জর্জ্জরিত রাধাবল্লভ তাহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইল না।

তিন

পুঁটি নাম্নী যুবতীটিই একদা রাধাবল্লভের হৃদয়-নাট্যনিকেতনে বিনা নোটিসে ঝড়াৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া গেল ট্রামের জানালা গলিয়া। কখন পৃথিবীতে কি ভাবে যে কি ঘটে তাহা বলা দুষ্কর। পুঁটির সম্বলের মধ্যে অবশ্য তাহার বয়স। কিন্তু সেই বয়সটা কত—ষোল কি ছাব্বিশ—তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার পূর্ব্বেই বেচারা রাধাবল্লভ মুগ্ধ হইয়া গেল। একবার মুগ্ধ হইয়া গেলে আর চালাকি চলে না। মন-রূপ অশ্বের মুখ হইতে মানুষ তখন যুক্তিরূপ বল্গা খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ঘোড়া চার পা তুলিয়া লাফাইতে থাকে। হইলও তাই। মুগ্ধ রাধাবল্লভ লুব্ধভাবে হ্যারিসন রোডে ঘুরিতে লাগিল। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। এমন ত কতবারই ঘটিয়াছে। হ্যারিসন রোডের ট্রামে আসিতে আসিতে কত বার কত মেয়েইত রাধাবল্লভের চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু এই দ্বিতলবাসিনী গবাক্ষবর্ত্তিনী পুঁটিকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন একযোগে বলিয়া উঠিল, মোনা লিসা! আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সমস্ত নায়িকাগণ

আসিয়া যেন রাধাবল্লভের মন-প্রাঙ্গণে শঙ্খ-হস্তে সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল পুঁটিকে বরণ করিবার জন্য। এমন ত আগে হয় নাই।

এত বড় বিপর্য্যয় রাধাবল্লভের জীবনে আর কখনও হয় নাই। প্রেমে পড়িলে শোনা গিয়াছে জ্যোৎস্নাকে উত্তপ্ত এবং রৌদ্রকে হিমশীতল বলিয়া মনে হয়। রাধাবল্লভের স্পর্শ-শক্তির কোন বৈকল্য ঘটিল না বটে, কিন্তু তাহার জনবহুল হ্যারিসন রোডকে নিতান্ত নির্জ্জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ওই দ্বিতল বাড়ীটা ছাড়া যেন হ্যারিসন রোডে আর কিছু নাই, বাকী সব হাওয়া—প্রেমাক্রান্ত রাধাবল্লভের এইরূপ ধারণা হইল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় রাধাবল্লভ সেদিন ঠিক হ্যারিসন রোডের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া শিস্-যোগে পুঁটিকে প্রেম নিবেদন করিতেছিল। এমন সময় পিতামহ প্রজাপতির খড়মখানা সজোরে আসিয়া লাগিল। কোথায় যে লাগিল তাহা ঠিক করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই বেচারা অজ্ঞান হইয়া গেল।

খড়মখানা আসিল অবশ্য 'লরি' রূপে।

চার

দয়ার শরীর ছিল বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি জীবনে বহুবার নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন ; দয়ালু রামকিঙ্কর হাজরাও হইলেন। নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াই হাবলি-মিণ্টা-পণ্টু-বিশু-খোকনের পিতা ছাপোষা হাজরা মহাশয় অচেতন রাধাবল্লভকে আনিয়া নিজের বাহিরের ঘরটাতে স্থান দিলেন। পাশে যে সদ্য-পাস-করা নবীন ডাক্তারটি ছিলেন তাঁহাকেও ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তারবাবু রাধাবল্লভকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এঁকে নড়ান উচিত নয়। নাড়া-চাড়া করলে মারা যেতে পারেন।" সুতরাং রাধাবল্লভকে হাসপাতালে পাঠাবার উদীয়মান ইচ্ছাটি দমন করিয়া দয়ালু রামকিঙ্কর-

বাবু বাড়ীতেই তাহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন। মনে দয়ার সঞ্চার হইলে পয়সা খরচ অনিবার্য্য। রামকিঙ্করবাবুকে গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া ডাক্তার ছোকরাটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী একটি 'আইস ব্যাগ' খরিদ করিতে হইল। যদিও হাজরা মহাশয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তথাপি তিনি মনে মনে কহিলেন, "গেরো আর কি!"

পাঁচ

দুই দিন পরে অচেতন রাধাবল্লভ চক্ষু খুলিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখে, দাঁড়াইয়া আছে পুঁটি নয়, হাবলি।

সে চক্ষু মুদিল।

একটু পরে আবার খুলিয়া দেখে, পুঁটি নয়, হাবলি।

ফলের রস করিয়া দিল হাবলি।

ঔষধ খাওয়াইল হাবলি। পুঁটি কই?

রামকিঙ্করবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছে?"

"আজ একটু ভাল।" কি সুন্দর স্বর হাবলির!

মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করে হাবলি।

বিছানা, কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া দেয় হাবলি।

মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দেয় হাবলি।

সব হাবলি।

আরও তিনদিন কাটিল।

পুঁটি নাই।

খালি হাবলি।

আবার খড়ম দেখা দিল।

এবার ছদ্ম বেশে নয়, স্বরূপে।

রামকিঙ্কর হাজরার হস্তে।

পাশাপাশি

এক

বসিয়া, শুইয়া, কাগজ পড়িয়া, তাস খেলিয়া, আড্ডা দিয়া, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গেলাম। শান্তি পাইতেছি না। আসল কারণ অর্থাভাব। আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষা পাস করিয়াছি, বহুস্থানে চাকুরির জন্য দরখাস্ত দিয়াছি—এমন কি কিছুদিন ইন্‌সিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই। অবশ্য এখনও অনেক কিছু করার বাকী আছে। ষ্টেশনারি দোকান বা মুদিখানা, অন্ততঃ পক্ষে একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ভাবি, কিন্তু—আঃ মাছির জ্বালায় অস্থির! যেই একটু শুইব ঠিক চোখের কোণটিতে আসিয়া বসিবে। এত মাছি আর এত গরম। সুস্থির হইয়া যে একটু চিন্তা করিব তাহার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম। এই দারুণ দ্বিপ্রহরে ঠায় বসিয়া চিন্তা করাও ত মুস্কিল! শুইলেই মাছি! হাতে পয়সা থাকিলে মাছি মারিবার আরক ছিটাইয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া চিন্তা করিতাম। আপনারা হয়ত হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন 'আচ্ছা চিন্তাশীল লোক ত!'

পেটের চিন্তার মত সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। দিন-রাত সেই চিন্তাই করিতেছি। চিন্তাশীল নই, আমি চিন্তাগ্রস্ত।

……ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কলিকাতা যাইব। কলিকাতায় গিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকাটা কিছু নয়। দোকানই যদি করিতে হয় কলিকাতাই বেস্‌ট্ ফিল্‌ড! চাকুরিও জুটিয়া যাইতে পারে। কিছুই বলা যায় না। এত কাল শুধু ঘরে বসিয়াই দরখাস্ত করিয়াছি। আপিসে আপিসে ঘুরিয়া বেড়াইলে একটা কিছু জুটিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলিকাতা যাওয়াই ঠিক।

পরদিন সকালে বাবার রূপার গড়গড়াটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্থ না লইয়া কলিকাতা যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 'রূপার গড়গড়া' শুনিয়া আপনারা ভাবিবেন না যে আমি কোন জমিদার-তনয়। তাহা নয়। বাবা সৌখীন লোক ছিলেন এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গড়গড়া বাঁধা দিয়া গোটা-দশেক টাকা মিলিল। হাতে আরও গোটা-দশেক ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম।

দুই

এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সম্পর্কটা এতই জটিল যে বিকাশবাবু আমার ঠিক কি তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। আমার মায়ের বোন-ঝির খুড়-শাশুড়ীর ভাইপোর পিস্‌তুতো শালার আপন ভায়রা ভাই এই বিকাশবাবু। রীতিমত অঙ্ক না কষিলে ঠিক সম্পর্কটি বাহির করা শক্ত। অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া প্রথম-সাক্ষাতেই তাহাকে বলিয়া বসিলাম, "কি ভায়া, চিন্‌তে পারছে!" ভায়া নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তথাপি বলিলেন, "অনেক দিন পরে কিনা! তাই একটু—মানে—বাঁশবেড়ে থেকে আসছেন বুঝি?"

বুঝিলাম বংশবাটিকাতেও ইহাদের বংশের কেহ আছেন। বলিলাম, "নাঃ চিন্‌তে পারনি দেখছি। চেনবার কথাও নয়। আসছি আমি বাঁকুড়া থেকে। মানে বাঁকুড়ারও ইন্‌টিরিয়ারে থাকি আমরা। আমি হলাম গিয়ে তোমাদের," বলিয়া মায়ের নিকট হইতে সম্পর্কের যে

ফরম্যুলাটা মুট মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা বলিয়া গেলাম এবং শেষকালে বলিলাম, "তুমি হ'লে গিয়ে আমাদের হেমন্তের ভায়রা ভাই। আপন লোক সব ক'লকাতার গলি-ঘুঁজিতে পড়ে আছ—দেখাশোনা আর হয়ে ওঠেনা। এবার মনে করলাম যাই একটু বিকাশ-ভায়ার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

কুলীর মস্তকস্থিত আমার বিবর্ণ ট্রাঙ্ক এবং মলিন বিছানাপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "থাকবেন নাকি এখানে ?"

"বেশী দিন নয়— দু-চার দিন !"

"ও।"

কুলী বিছানাপত্র নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে দেখিলাম বিকাশভায়াও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্থৈর্য্য অবশ্য বেশীক্ষণ টিকিলনা। নানা আকৃতির একপাল ছেলে-মেয়ে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কেহ বলে, "লজেঞ্জুস্ !" কেহ বলে, "ঘুড়ি চাই !" কেহ কিছু না বলিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল। আমার কর্ণমূলে একটি আঁচিল ছিল—তাহা লইয়া কেহ কেহ ভারি খুশী হইয়া উঠিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরাই শুধু জমাইতে পারে !

…বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

তিন

তিন দিন কাটিল। কলিকাতায় প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলাম—অধ্যয়ন উপলক্ষে। এখন ঘুরিয়া দেখিলাম আমার পরিচিত একজনও নাই। সহপাঠিগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকেরা সব নূতন লোক। যে মেসে পূর্ব্বে থাকিতাম তাহা এখন

"ডাইং ক্লিনিং" হইয়াছে। আমাকে কেহ চিনিল না—আমিও কাহাকেও চিনিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় বিকাশভায়ার বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উপর্য্যুপরি তিন দিন এইরূপে কাটিল। বিকাশবাবুর সহিত একটু দেখা হয় সকালে। সমস্ত সকালটা তিনি তাড়াহুড়া করিতে থাকেন, যেন 'লেট' না হইয়া যায়। গামছা লইয়া সকালে বাহির হইয়া যান—ফিরিয়া বাজারটা রাখিয়াই তেল মাখিতে বসেন। কোন রকমে গায়ে মাথায় তেল চাপড়াইয়া কলতলায় স্নান করিতে করিতেই গৃহিণীকে হুকুম দেন, "ভাত বাড়। ওগো শুন্‌ছ—লেট হয়ে যাবে—পৌনে নটা হ'ল—যেতেও ত আবার খানিকক্ষণ লাগবে—" তাহার পরই ঊর্দ্ধশ্বাসে নাকে-মুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। ফেরেন কোন দিন রাত্রি দশটা, কোনও দিন এগারটা। সুতরাং বিকাশবাবুর সহিত আলাপ বেশীক্ষণ জমাইবার অবসর পাইনা। ভাবি—"কাজের মানুষ!" বিকাশভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিসে যায়, সারাদিন কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে —রাত্রে আরামে ঘুমায়। বিকাশভায়ার শরণাপন্ন হইলে কেমন হয়? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই একটা চাকরি ও আমাকে জুটাইয়া দিতে পারে।

চার

পরদিন সঙ্গ লইলাম।

ঠিক তখন সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে তখন বলিলাম, "ভায়া, আমিও তোমার সঙ্গে একটু বেরুবো।"

"আমার সঙ্গে? কেন?"

"একটা কথা ছিল। মানে—"

"তাহ'লে আসুন। দেরি করবেন না—আমার 'লেট' হয়ে যাচ্ছে। দেরি হয়ে গেলে সে ব্যাটা এসে পড়বে—"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে বিকাশবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরকারটা কি ?"

"অর্থাৎ—" কি করিয়া কথাটা বলিব ভাবিতে লাগিলাম।

"টাকাকড়ি আমি ধার দিতে পারব না,—সেটা আগেই জানিয়ে রাখছি।"

"না—না, টাকাকড়ি চাই না। আচ্ছা চল ট্রামেই বলব এখন !"

"ট্রামে ত আমি যাব না। আমি হেঁটে যাব।"

"বেশ ত ! চল আমিও হেঁটে যাই। কতদূর ?"

"ইডেন গার্ডেন।"

"ইডেন গার্ডেনে আপিস্ ? কিসের আপিস্ ?"

"আপিস্ কে বল্‌লে আপনাকে !" বলিয়া বিকাশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন !

"তবে ?"

"আরে রামঃ—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি রোজ আপিসে যাই ?

"কোথা যাও, তা'হলে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে যাই !"

নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম ! বিকাশবাবু বলিয়া চলিলেন, "বাবা কিছু টাকা fixed deposit রেখে গিয়েছিলেন —তারই ৪০৲ সুদ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তিন বছর অবিরাম চেষ্টা ক'রেও চাকরি জোটাতে পারিনি। অথচ এম্ এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস

পেয়েছিলাম ! চলুন—'লেট' হয়ে যাচ্ছে—সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাবনা !

উভয়ে আবার খানিক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলাম। বিকাশ বাবু আবার বলিলেন, "বাড়ীতে কথাটা আবার ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন ! বউ জানে আমি কোন বড় আপিসে বিনা-মাইনেতে 'অ্যাপ্রেন্টিসি' করছি। কিছুদিন পরে মাইনে হবে। তাই তাড়াতাড়ি রোজ ভাত রেঁধে দেয় !"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পাশাপাশি চলিয়াছি। আবার বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে আসি। বুঝলেন না ? বাড়ীতে ওই একপাল ছেলে নিয়ে বসে থাকা অসহ্য ! সারাক্ষণ ওদের বায়না লেগেই আছে ! বাঁশী কিনে দাও, লজেন্‌স্ দাও পুতুল দাও ! পাশের বাড়ীর ছেলের লাল জামা হয়েছে সেই রকম জামা ক'রে দাও ! গিন্নীরও নানা রকম আবদার আছে।—সরে পড়ি ! বুঝলেন না !"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার বিকাশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীতে থাকলেই গোলমাল। বুঝলেন না। সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটার পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে। নাক দিয়ে রক্তও পড়েছিল প্রচুর। বাড়ীতে থাকলে হৈ হৈ ক'রে একটা ডাক্তার ফাক্তার ডাকতে হ'ত ধার ক'রেও ! ছিলাম না—নিশ্চিন্ত— !—চলুন একটু পা চালিয়ে—ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে—সেইটেতে গিয়ে শুয়ে ব'সে সারাদিনটা—বুঝলেন—লেট, হয়ে গেলে আবার আর এক ব্যাটা এসে সেটা দখল করে—বুঝলেন !"

পাশাপাশি দুই জনে দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিয়াছি।

ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হইয়া যায় !

বিদ্যাসাগর

বিদায় লইবার প্রাক্কালে বিনীত নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া গেল—"ওই মোড়টায় ডিসপেন্‌সারী খুলেছি, মাষ্টার মশায়—দয়া করে যাবেন মাঝে মাঝে—"

"আচ্ছা।"

…স্মৃতিপটে কয়েকটি ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে।

পুরাতন ছবি।

* * * *

তখন টিউশনি করিতাম।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার বি, এ, ফেল করার দরুণই হউক অথবা শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দের সাক্ষাৎ লাভের ফলেই হউক—ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল। স্বামী চিন্ময়ানন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিতাম। বুঝিতাম কর্ম্মজগতে যাহাই হউক ধর্ম্মজগতে হিন্দুরা অপরাজেয়। দিনের পর দিন স্বামিজী যে সকল তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা আমাকে শুনাইতেন সেগুলি এই গল্পের পক্ষে অবান্তর। যেটুকু প্রাসঙ্গিক তাহাই শুনুন।

একদিন তিনি জন্মান্তর-রহস্য প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করিতেছিলেন—এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আমি শুনি নাই। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহাকে ধরিলাম—জন্মান্তর-রহস্য-উদ্‌ঘাটনের পন্থা বলিয়া দিতে হইবে।

প্রথমটা তিনি আপত্তি করিলেন।

ছাড়িলাম না—

শেষে তাঁহাকে বলিতেই হইল।

তাঁহার উপদেশানুসারে মুদ্রিতনেত্রে নানাবিধ যৌগিক প্রক্রিয়া সুরু করিয়া দিলাম।

জন্মান্তর-রহস্য-উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে।

* * * *

ছাত্রের পড়া লইতেছিলাম।

—সাধু শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে কি হবে?

বলিতে পারিল না।

—মুনি শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে কি হবে?

পারিল না।

—নর শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে কি হবে?

অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া একটা উত্তর দিল—ভুল উত্তর। ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া উপক্রমণিকাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

…এইরূপ প্রত্যহ।

হঠাৎ বাসনা হইল ছোকরা পূর্ব্বজন্মে কি ছিল একবার দেখিলে হয়। আমার বিশ্বাস, হয় গাধা না হয় গরু ছিল। স্বামিজীর প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা ত খুবই সহজ!

সেদিন গভীর নিশীথে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদিতনেত্রের

সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে আমার ছাত্রের পূর্ব্বজন্মের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

এ কি—এ যে বিদ্যাসাগর—

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর !

স্বয়ং উপক্রমণিকার জন্মান্তর-রহস্যের ফেরে পড়িয়া নব শব্দের রূপ বলিতে পারিতেছেন না ! আশ্চর্য্য ব্যাপার !

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একবর্ণ নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাকে আমার আর শাসন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

ইচ্ছা হইল, প্রণাম করি—

অশ্রুজলে তাহার চরণ দুখানি ধুইয়া দিই।

বিদ্যাসাগরের এই দশা !

যতদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলাম শাসন করিতে পারি নাই—সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম।

ফলে সে ফোর্থ ক্লাস হইতে কিছুতেই প্রমোশন পাইল না।

আমার চাকরিটি গেল। ভাগ্যক্রমে অন্যত্র একটা কেরাণীগিরি জুটিয়া গেল—চলিয়া গেলাম।

* * * *

বছর পাঁচেক পরে আমার নূতন কর্ম্মস্থলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আবার দেখা হয়। সব কথা শুনিলাম। পড়া-শোনা ছাড়িয়া দিয়া

দিনকতক সে সখের থিয়েটারে মাতিয়াছিল। স্ত্রী-চরিত্র নাকি উত্তম অভিনয় করিত। মেডেল পাইয়াছে। সম্প্রতি কিন্তু সে লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট—আমি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহার কোম্পানীতে—

আমার চোখে জল আসিল।

সাধ্যাতীত হইলেও কিছু ইন্‌সিওর করিলাম।

আবার আজ সে আসিয়াছিল।

চেহারাটা বেশ ভদ্র ভারিক্কি গোছের হইয়াছে। বলিল, ইন্‌সিওরেন্সের দালালি করিয়া সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই। সেইজন্য প্রাইভেট হোমিওপ্যাথি পড়িয়া সে ডাক্তার হইয়াছে এবং এই সহরে প্র্যাকটিস্ করিবে মনস্থ করিয়াছে। আমি যেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করি।

যথাসাধ্য করিব—প্রতিশ্রুতি দিলাম।

নিষ্প্রয়োজনবোধে দুইটি খবর তাহাকে দিলাম না। খবর দুইটি এই—

(১) স্বামী চিন্ময়ানন্দ চৌর্য্যাপরাধে জেল খাটিতেছেন।

(২) আমি ক্রিশ্চান হইয়াছি।

পাঠকের মৃত্যু

এক

প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা।

আসানসোল ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। ঠিক আমার পাশেই আর একজন বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানি বই ছিল। বেশ মোটা একখানি উপন্যাস। আলাপ-পরিচয় হইলে জানিতে পারিলাম যে ভদ্রলোককে ট্রেণের জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমার ট্রেণেরও ঘণ্টা তিনেক দেরী ছিল।

আমরা উভয়েই বাঙালী।

সুতরাং পাঁচ মিনিট পরেই তাঁহাকে যে প্রশ্নটি আমি করিলাম তাহা এই—"আপনার বইখানা একবার দেখতে পারি কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন না—"

এই উত্তরই স্বাভাবিক এবং আশাও করিয়াছিলাম।

অবিলম্বে বইখানি দখল করিয়া বসিলাম।

দুঃসহ গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহর।

আসানসোল ষ্টেশনের টিনের ছাদ।

সমস্ত কিন্তু তলাইয়া গেল।

উপন্যাস অদ্ভুত।

বহির মালিক ভদ্রলোক আড়-নয়নে একবার আমার পানে চাহিয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন এবং একটি টাইম্ টেব্ল্ বাহির করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া চলিলাম।

* * * * *

চমৎকার বই।

বস্তুতঃ এমন ভালো উপন্যাস আমি ইতিপূর্ব্বে পড়ি নাই।

একেবারে যেন জুতাইয়া দিতেছে।

* * * * *

দুই ঘণ্টা কাটিল।

বহির মালিক ভদ্রলোক টাইম্ টেব্‌ল্‌টি বারংবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অবশেষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার ট্রেণের ত আর বেশী দেরী নেই। এইবার—"

বলিয়া একটু গলা খাঁকারি দিলেন।

আমি তখন তন্ময়।

চকিতে একবার হাত-ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম। এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। বই কিন্তু অর্দ্ধেকের উপর বাকী। বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলাম না। গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

অদ্ভুত বই।

বাকী ঘণ্টাটা যেন উড়িয়া চলিয়া গেল।

আমার ট্রেণের ঘণ্টা পড়িল।

বইএর তখনও অনেক বাকী।

রোখ চড়িয়া গিয়াছিল।

বলিলাম—“নেক্‌স্‌ট্‌ ট্রেণে যাব—এ বই শেষ না করে উঠছি না!”

বহির মালিক ভদ্রলোক একটু কাসিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

ট্রেণ চলিয়া গেল—বই পড়িতে লাগিলাম।

শেষ কিন্তু করিতে পারি নাই।

শেষের দিকে অনেকগুলি পাতা ছিল না।

বহির মালিককে বলিলাম—“এঃ, শেষের দিকে এতগুলো পাতা নেই! আগে বলেন নি কেন? ছি ছি—”

এতদুত্তরে ভদ্রলোক কেবল নিষ্পলকনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলাম তাঁহার রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

দুই

দশ বৎসর পরে উক্ত পুস্তকখানি আর একবার আমার হস্তগত হইয়াছিল।

আমার ভাগিনেয়ীর শ্বশুরালয়ে।

তাহাকে পৌঁছাইতে গিয়াছিলাম। সেই দিনই ফিরিয়া আসার কথা। কিন্তু বইখানির লোভে থাকিয়া গেলাম।

সুযোগমত বইখানি সংগ্রহ করিয়া আবার সাগ্রহে সুরু করা গেল। খাপছাড়াভাবে শেষটুকু না পড়িয়া গোড়া হইতেই আবার জমাইয়া পড়িব ঠিক করিলাম।

কয়েক পাতা পড়িয়াই কেমন যেন খট্‌কা লাগিল।

উল্টাইয়া দেখিলাম—হ্যাঁ সেই বইই ত!

আবার কয়েক পাতা অগ্রসর হইলাম—নাঃ কেমন যেন গোলমাল ঠেকিতেছে।

তবু পড়িতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মনে হইল—নাঃ—আর ত চলে না।

এ কি সেই বই যাহা আমি আসানসোল ষ্টেশনে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে উর্দ্ধশ্বাসে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম?

এমন রাবিশ্ মানুষে লেখে!

এ শেষ করা ত অসম্ভব!

দশ বৎসর আগেকার সেই উৎসুক পাঠক কবে মারা গিয়াছিল টেরও পাই নাই।

এবারও বই শেষ হইল না।

দত্ত মহাশয়

এক

"ছোকরার গোঁফ ওঠেনি এখনও ভাল করে—এরই মধ্যে এই কাণ্ড—গোঁফ উঠলে না জানি—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দত্ত মহাশয় নয়নের দৃষ্টিকে নিজ গুম্ফমুখী করিলেন এবং একটি পাকা গোঁফ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট বিশ্বাসকে বলিলেন—

"আর কটা আছে দেখ ত হে। এঃ এরকমভাবে পাকলে ত হু'দিনেই সব সাফ হয়ে যাবে দেখছি—"

"কই আর নেই ত। যেটা ছিঁড়লে দেখি ওটা—"

ছিন্ন রোমটি দত্ত মহাশয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যেই ছিল।

বিশ্বাসকে সেটি তিনি দিলেন।

বিশ্বাস সেটি নাড়িয়া চাড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে বলিলেন—"তুমি কাঁচা গোঁফগুলো অমন পট্ পট্ ছিঁড়ে ফেল্‌ছ কেন বল দেকি? এ গোঁফ কি পাকা? এ ত তামাকের ধোঁয়া লেগে অমন হয়েছে—"

দত্ত মহাশয় ইতিমধ্যে আর একটি গোঁফ ছিঁড়িয়াছিলেন।

বলিলেন—"আচ্ছা, এটা দেখ ত—"

"এটা ত একেবারে ডাহা কাঁচা—তামাকের রঙ্ পর্য্যন্ত ধরেনি। আর ছিঁড়ো না।"

দত্ত দক্ষিণ চক্ষুটি বুজিয়া বক্রায়িত বাম চক্ষুর দৃষ্টিটিকে বাম গুম্ফপ্রান্তে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ওষ্ঠটিকে নানাভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত করিয়া আবার নূতন শিকারের চেষ্টায় ছিলেন। বিশ্বাসের কথার তিনি কোন প্রতিবাদ করিলেন না—কিন্তু অচিরাৎ তৃতীয় একটি রোম তিনি মুখভঙ্গী সহকারে উৎপাটন করিলেন এবং সেটিও বিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রথম প্রসঙ্গে উপনীত হইলেন।

"ছোকরা তাহলে মোকদ্দমায় পড়েছে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! তুমি শুনলে কোথা থেকে খবরটা? সেদিন সন্ধ্যে বেলা আমি ষ্টেশনের দিকে গিয়েছিলাম একবার বেড়াতে বেড়াতে, তখনি ছোকরার রকম সকম দেখে কেমন যেন আমার সন্দেহ—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দত্ত মহাশয় থামিলেন।

বিশ্বাস তৃতীয় গোঁফটির সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য করিলেন না। গা চুলকাইতে লাগিলেন।

দত্ত মহাশয়ের মুদ্রাদোষ যেমন গোঁফ ছেঁড়া—বিশ্বাস মহাশয়েরও মুদ্রাদোষ তেমনি গা চুলকানো। শুধু চুলকাইয়াই তিনি নিরস্ত হন না। সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কি যেন আহরণ করিয়া আনেন, সেই আহরিত বস্তুটি আঘ্রাণ করেন এবং পর মুহূর্ত্তেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সেটি ফেলিয়া দেন। তাহাই করিতেছিলেন।

দত্ত নাসিকার ঠিক নিম্নবর্ত্তী গুম্ফগুচ্ছটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—"তুমি কি শুনে এলে?"

কণ্ডূয়ন-নিরত বিশ্বাস উত্তর দিলেন—"ওই বাঁড়ুয্যে উকীল কাকে যেন রাস্তায় বলছে কানে এল—একটা মেয়েকে নিয়ে ছোটবাবু আমাদের

কেসে পড়েছেন। ভাল করে জিগ্যেস করিনি আমি—পথে আসতে আসতে কানে এল। ষ্টেশনে তুমি কি দেখেছিলে সেদিন ?”

দত্ত উষ্ণস্বরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—“দেখব আর কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু। প্ল্যাটফরমের ওপর বসে আছে দেখলাম জরিদার ওড়না পরা এক বাঈজি গোছের—সুন্দরী—যুবতী। আর তার কাছে এক রোগা গোছের বুড়ো। পাকা দাড়ীতে মেহেদির রঙ লাগানো—গায়ে আধময়লা গোছের পাঞ্জাবী আর পায়জামা। ওমর খৈয়াম কেতাবে যেমন সব ছবি থাকে আজকাল হে—ঠিক তেমনি। ষ্টেশনের ছোটবাবু দেখলাম ঘন ঘন চাইছেন সেদিকে—ষ্টেশনে আর জনপ্রাণী নেই—” বলিয়া দত্ত মহাশয় আবার হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন এত কথা বিশ্বাসটাকে না বলিলেই তিনি পারিতেন। কি দরকার ছিল।

বিশ্বাস অঙ্গ হইতে আহরিত বস্তুটি শুঁকিয়া কুঞ্চিত-নাসা হইয়া ছিলেন। দত্তের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিয়া উঠিলেন “—ওই—ওই। ওড়না-পরা মেয়ে আর—লাল-দাড়ী বুড়োকেই আমাদের বাঁড়ুয্যে উকীল স্বচক্ষে আজ আদালতে দেখে এসেছে। আমাদের ছোটবাবুও ছিল। তুমি যা বল কথাটা ঠিকই দেখছি। গোল্লায় গেছে আজকালকার ছেলেগুলো। আচ্ছা, তুমি অনর্থক বসে কাঁচা গোঁফগুলো ছিঁড়ছ কেন বল দেখি—”

বিশ্বাস মহাশয় গত এক বৎসর হইতে দত্তের পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দত্ত ইহার প্রতিবাদ করেন না। বিশ্বাসের এই অত্যুক্তিটুকু উপভোগ করিতে করিতে তিনি পাকা গোঁফগুলি তুলিতে থাকেন। বিশ্বাসের কথায় ভুলিয়া পাকা গোঁফ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন তেমন কাঁচা ছেলে দত্ত মহাশয় নহেন।

পাত্রী পক্ষ পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া ভুল করিবে না।

বিশ্বাসও করিতেন না যদি না তাঁহার যখন তখন টাকা ধার লওয়ার প্রয়োজন থাকিত।

দত্ত বোঝেন সবই—বলেন না কিছু।

দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষটি গত হইয়াছেন।

তৃতীয় পক্ষের সন্ধানে আছেন তিনি।

দুইটি প্রধান অন্তরায়।

পাকা গোঁফ এবং অনূঢ়া বিবাহযোগ্যা কন্যাটি।

কন্যার বিবাহ না দিয়া তাঁহার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব।

কন্যাটির বিবাহ হইয়া গেলে দত্ত মহাশয় স্বচ্ছন্দে শুভকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু কিছুতেই মনোমত পাত্র জুটিতেছে না।

গা চুলকাইতে চুলকাইতে বিশ্বাস বলিলেন—“ছোকরা তাহলে বেশ ঘুঘু—”

দত্ত উঠিয়া গিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে ছোট হাত আয়নাটি বাহির করিয়া আনিয়া গুম্ফরাজি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাস আবার তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“জেল হওয়া উচিত—চাকরি যাওয়া উচিত—এসব লোকের। পাজি, চরিত্রহীন, বখাটে সব ছোকরা—”

বিশ্বাসের এত উষ্মার কারণ ছিল। তাঁহার ধারণা তিনি নবাগত ষ্টেশনের ছোটবাবুটির নিন্দা করিয়া দত্ত মহাশয়ের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। দত্তের কাছে আজকালকার ছেলেদের গালাগালি দিয়া বিশ্বাস মহাশয় বরাবর সুফল পাইয়া থাকেন। আজ তাঁহার কিছু টাকার দরকার। সুতরাং পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া এবং আজকালকার ছেলেছোকরাদের গালাগালি দিয়া—অর্থাৎ দুই-নলা বন্দুক দিয়া বিশ্বাস মহাশয় লক্ষ্যভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্ব্বে বহুবার তিনি এই পন্থায় সফলকাম হইয়াছেন।

……দত্তর কিন্তু আজ কোন সাড়া শব্দ নাই।

গা চুলকানো বন্ধ করিয়া বিশ্বাস আড়চোখে একবার দত্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

দত্ত উপরের ঠোঁটকে নীচের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া নিবিষ্ট মনে দর্পণে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছেন।

বিশ্বাস ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে দত্ত মহাশয়ের মনের প্রসন্নতা ঠিক ততদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা যতদূর হইলে নির্ভয়ে টাকার কথাটা পাড়া যায়।

সুতরাং গা চুলকাইতে চুলকাইতে তিনি আর একটি গুলি ছাড়িলেন! "আজকালকার ছেলেরা, বিশেষতঃ ওই খদ্দরধারীগুলো—"

হঠাৎ দত্ত আয়নাটি টেবিলের উপর রাখিয়া চক্ষুর দৃষ্টি বিশ্বাসের দিকে ফিরাইলেন।

বিশ্বাসের অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

চক্ষু দুইটি যেন—দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড।

একি হইল !

চক্ষু যাহাই হউক মুখে কিন্তু দত্তের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল ।

তিনি বলিলেন—"টাকার দরকার আছে নাকি ? আজ আমার হাতে টাকা নেই বিশ্বাস !"

বিশ্বাস মনে মনে মরিয়া গেলেন ।

মুখে কিন্তু বলিলেন—"না টাকার দরকার নেই—"

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন । আর বসা বৃথা। বিশ্বাস পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন দত্ত আজ চটিল কেন. এমন ত কখনও হয় নাই ।

দুই

একটু পরেই দত্তের বৈঠকখানায় বাঁড়ুয্যের আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহারও আগমনের কারণ টাকা। দত্তের নিকট তিনিও আসিয়াছিলেন টাকা ধার করিতে। হঠাৎ দরকার পড়িয়া গিয়াছে।

উকীল হইলেও বাঁড়ুয্যে স্পষ্টবক্তা, সাধা-সিধা মানুষ ।

দর্পণ হস্তে গুম্ফচয়ন-নিরত দত্তকে তিনি বলিলেন—"আর উপড়ে কি আর ওর কিনারা করতে পারবে—তার চেয়ে ও আপদ কামিয়ে ফেল—"

দত্ত কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

প্রতিবাদ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। যে যাহা বলে শুনিয়া যান—যেটুকু স্মরণযোগ্য মনে করিয়া রাখেন—বাকীটা অপর কর্ণ দিয়া বাহির

করিয়া দেন। সোজা হিসাব। তর্ক করিয়া লাভ কি? বাঁড়ুয্যে কাজের কথা পাড়িলেন।

"শ পাঁচেক টাকা দিতে পারবে হে? হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব—সুদও দেব—"

দত্ত মহাশয় কুশীদজীবী এবং সেই কারণেই ধনী।

সুতরাং নিঃসঙ্কোচে মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কত সুদ দেবে?"

"যত চাও—মাস খানেকের মধ্যেই শোধ করে দেব—"

দত্ত মহাশয় আয়নাটি টেবিলের উপর রাখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

"আচ্ছা, ষ্টেশনের নতুন ছোটবাবুটির নামে কি মোকদ্দমা হয়েছে নাকি একটা মেয়েকে নিয়ে। জানো তুমি?—"

"হ্যাঁ জানি বই কি—আমিই ত উকীল ছিলাম রেলের পক্ষের। কিছুই নয়—একটা বাঈজি আর তার সঙ্গে এক সারেঙ্গিওলা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল—ছোটবাবুটি তাদের ধরে চালান দিয়েছিল। ছোকরা ভারি অনেষ্ট্। অপর কেউ হলে দুচার পয়সা নিয়ে ছেড়ে দিত—"

দত্ত আবার আয়নাটি তুলিয়া গোঁফ দেখিতে লাগিলেন।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—"দেবে নাকি টাকাটা?"

"এখুনি চাই?"

"পেলে ত ভালই—"

দত্ত তৎক্ষণাৎ কোমর হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া দেওয়ালে প্রোথিত লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাণ্ডনোট ফ্যাণ্ডনোট দিতে চাও দিও—সুদ আর দিতে হবে না তোমাকে। বামুনের কাছ থেকে এ কটা টাকার কি আর সুদ নেব একমাসের জন্য—"

"অনেক ধন্যবাদ—"

বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেলেন।

তিনিও পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন দত্ত আজ হঠাৎ এমন দিলদবিয়া হইয়া উঠিল কেন!

তিন

আধুনিক ছেলেদের নিন্দা করিলে দত্ত খুশি হইত—কিন্তু বিশ্বাস আজ দত্তকে খুশি করিতে পারে নাই। বাঁড়ুয্যের স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি বাঁড়ুয্যের উপর চটা—অথচ তাহারই উপর আজ তিনি প্রসন্ন হইয়া বিনা সুদে বিনা হ্যাণ্ডনোটে টাকা দিয়া দিলেন।

কারণ ছিল।

মূল কারণ—সেই তৃতীয় পক্ষ।

ষ্টেশনের ছোটবাবুটিকে দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের ভাল লাগে। স্বজাতি এবং পালটি ঘর শুনিয়া তিনি ছোটবাবুর পিতার ঠিকানা সংগ্রহ করেন। পত্রযোগেই তিনি নিজ অনূঢ়া কন্যাটির সহিত ছোটবাবুর বিবাহ প্রায় পাকাপাকি করিয়াআনিয়াছেন। কুষ্ঠি মিল হইয়াছে—দেনা-পাওনাও প্রায়

স্থির হইয়া গিয়াছে। দত্ত মহাশয়ের চাপা স্বভাব। গোপনেই তিনি সব করিতেছিলেন। হঠাৎ সেদিন ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়া—ওই বাঈজি মাগীকে দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের মনে দারুণ খট্‌কা লাগিয়া যায়। ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ভাল ত? আজকালকার ছেলে বলা ত যায় না। ছেলেটিকে দেখিলে ভাল বলিয়াই ত মনে হয়।

যাক্—এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পাত্রের অর্থাৎ ছোটবাবুর পিতাকে তিনি পত্র লিখিলেন যে অবিলম্বে তিনি যেন আসিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। উঃ—বিশ্বাসটা মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল।

পত্রখানি লিখিয়া দত্ত মহাশয় আবার দর্পণটি তুলিয়া লইলেন এবং ভ্রূকুটিকুটিল মুখে গোঁফ জোড়াটার পানে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া দর্পণটি রাখিয়া পাঁজি খুলিয়া হঠাৎ পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। একটি পাতায় আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল এবং সেই পাতা হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আর একটি পত্র তিনি লিখিলেন। পত্র শেষ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—"পয়সার মায়া করলে চলবে না—ভেস্তে যাবে সব—"

দ্বিতীয় পত্রখানি লিখিলেন কলপের জন্য।

মিষ্টার মুখার্জ্জি

মিষ্টার মুখার্জ্জি কবে যে আমাদের আড্ডায় আসিয়া জুটিয়াছিলেন তাহা মনে নাই। এইটুকু শুধু মনে আছে স্বর্গীয় মধুমামা একদিন তাঁহাকে আমাদের আড্ডায় লইয়া আসেন। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে তিনি ধূমকেতুর মত আমাদের আড্ডায় আসেন যান। তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমরা কেহ জানি না।

লোকটির বিশেষত্ব আছে।

তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলে মনে হয় যেন সমস্ত দুনিয়াখানা তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে তিনি সেটা গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারেন—ফেলিয়া দিতে পারেন—পকেটেও পুরিতে পারেন। সম্প্রতি লুফিতেছেন—তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ। প্রায়ই তিনি তুড়ি মারিয়া বলিয়া থাকেন—"ওসব আমি থোড়াই কেয়ার করি—বুঝলেন।"

বুঝি ত সবই।

মুখার্জ্জি যে একজন উঁচুদরের মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু আমরা কেহ কোন দিন মুখার্জ্জির কথার প্রতিবাদ করি নাই। করি নাই—কারণ তাঁহার মিথ্যাকথাগুলি শুনিতে বেশ লাগিত। এ বিষয়ে তিনি প্রকৃত আর্টিষ্ট ছিলেন। রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট চেহারা। ক্ষৌরির অভাব মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট। আধময়লা সাহেবী পোষাক গায়ে। শুনিয়াছি লোকটি বিলাত-ফেরৎ—পৃথিবীর অনেক দেশ নাকি দেখা আছে—নিজেই এসব বলিতেন। লোকটি নিতান্ত মূর্খ যে নয় তাহা অবশ্য তাঁহার কথাবার্ত্তাতেই বোঝা যাইত। তিনি নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন যে তিনি নাকি ডবল এম্, এ। তিনবার প্রফেসারি পাইয়া নাকি ত্যাগ করিয়াছেন—ইত্যাদি।

একদিন তিনি বলিতেছিলেন—

"মহাত্মাজীর সঙ্গে সেদিন দেখা--গাড়ীতে। থার্ড ক্লাসের একটি কোণে বসে বসে তকলি ঘোরাচ্ছেন—আমাকে দেখতে পেয়ে একটু মৃদু হাস্‌লেন। আফ্রিকার সে দিনগুলো মনে পড়ে গেল বোধ হয়। উনি যখন আফ্রিকায় যান তখন আমিও সেখানে কিনা—খুব জমাতুম দু'জনে। দেখলাম ভদ্রলোক চিনেছেন আমাকে! এগিয়ে গেলাম। আফ্রিকার সে দিনগুলো মনে পড়ে গেল। ভাবলাম একটু ইয়ার্কি করা যাক। বললাম—মহাত্মাজী, আপনি যে দেশসুদ্ধ লোককে নিরামিষাশী হতে বলেছেন, তার আর একটা দিক ভেবে দেখেছেন? সবাই যদি আপনার কথা শোনে তাহলে আর একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে তা ভেবে দেখেছেন ?

মহাত্মাজী বললেন—কি সমস্যা ?

আমি বললাম—ছাগল সমস্যা। ওদের না খেয়ে ফেললে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে যে এই কৃষিপ্রধান দেশের। ছাগলে একবার যে গাছে মুখ দেয় সে গাছের দফা রফা। এক একটা ছাগলের কটা বাচ্চা হয় জানেন বছরে? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুখার্জ্জি বলিয়া উঠিলেন—"এক্সকিউজ মি, আমাকে উঠতে হবে এখুনি। বাইরের ঘরে টেবিলে আমার পার্স'টা ফেলে এসেছি—তাতে একটা হাজার টাকার চেক আছে—যদিও ক্রস্‌ড্‌—তবু"—মিষ্টার মুখার্জ্জি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কলিকাতার কোন্ অঞ্চলে যে তিনি থাকেন তাহা কেহ জানিত না। কেহ বলিত বালিগঞ্জ—কেহ বলিত বেলেঘাটা। ভবেশ, পান্নু প্রভৃতির দৃঢ় বিশ্বাস বৌবাজার অঞ্চলেই কোথাও থাকেন তিনি। পরদিন তাঁহাকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনার বাসাটা কোন্‌খানে মিষ্টার মুখার্জ্জি? হাসিয়া তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া

বলিয়াছিলেন "মঙ্গলগ্রহে এখনও জমি কিনে উঠতে পারিনি। এই পুরানো পৃথিবীতেই এখনও বাস করতে হচ্ছে এই যা দুঃখ। কাশ্মীরই বলুন আর সুইজারল্যাণ্ডই বলুন—সব এক। নিউইয়র্কে, রোমে, প্রাগে, বালিনে, টোকিওতে, এমন কি ভল্‌গা নদীর তীরেও কাটিয়ে এসেছি বহুদিন—সর্ব্বত্রই সেই বুড়ী পৃথিবী—একঘেয়ে! এরোপ্লেনটার আর একটু উন্নতি হলেই দেখবেন দলে দলে লোক অন্য প্ল্যানেটে পালাবে। ওহো, বাই জোভ্—উঠতে হল এবার—মিসেস নাইডুর সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে—"

সকলকে বিস্মিত করিয়া মুখার্জ্জি প্রস্থান করিলেন।

সেদিনও আসিয়াছিলেন এবং সেদিনও বার্টাণ্ড রাসেল, বার্ণাড শ, বল্‌ডুইন্, ব্লুম, শেক্সপীয়র, গ্যেটে সকলকে ছাতু করিতে করিতে তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল যে আমেরিকার জনৈক কোটিপতির একমাত্র কন্যার জন্য উড়িষ্যার কারিগরের কাজ-করা এক জোড়া মিনা-করা দুল পাঠাইবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুত আছেন। পরশ্ব দিন দুল জোড়া উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছ—আজ এয়ার মেল ডে—সুতরাং আমরা যেন তাঁহাকে এক্সাকউজ করি।

লোকটা বেশীক্ষণ কিছুতেই বসিত না।

ধূমকেতুর মত আসিত এবং চলিয়া যাইত।

লোকটা চালিয়াৎ—মিথ্যাবাদী—সবই বুঝিতাম!

তবু বেশ লাগিত।

আমাদের আড্ডায় সেদিন একটু আহারাদির আয়োজন ছিল। উপলক্ষ—পানুর প্রেমের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। পানু তাহার প্রেমাস্পদাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। পাশের একটি রেস্তোঁরা হইতে দেশী বিদেশী

নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনানো হইয়াছে। ভবেশ আবেগভরে "স্বর্গ হইতে বিদায়" আবৃত্তি করিতেছে—বিমলদা দক্ষিণ চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া ক্ল্যারিওনেট্ বাঁশিতে 'নি' পরদায় সুর খেলাইয়া করুণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন—বিকাশ টেবিলে তবলা বাজাইতেছে—জগু গ্লাসে গ্লাসে সরবৎ ভরিতেছে—পানু প্লেটগুলি সাজাইতেছে—আমি এক কোণে বসিয়া কড়ে আঙুলের কড়াটা কাটিতেছি—অর্থাৎ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় মিষ্টার মুখার্জ্জি আসিয়া হাজির।

পানু সোল্লাসে বলিল—" বাঃ, ভালই হয়েছে মিষ্টার মুখার্জ্জিও এসে পড়েছেন। আপনার ঠিকানাটা ঠিক জানি না ত যে আপনাকে খবর দেব। আজ আমাদের একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন আছে—মিষ্টার মুখার্জ্জি—"। করজোড়ে মুখার্জ্জি বলিলেন—"মাপ করবেন—খেতে পারব না কিছু। সন্ধ্যের সময় এসপ্ল্যানেডের মোড়ে মিস্ মিউলের সঙ্গে দেখা। অষ্ট্রেলিয়ায় আমার টেনিস পার্টনার ছিল। ছাড়লে না কিছুতে—ফির্পোতে ঢুকে গিলতে হল ওর সঙ্গে বসে। ফির্পোতে অনেক দিন ঢুকিনি—ভয়ঙ্কর ডিটিরিওরেট্ করেছে আজকাল। মিস্ মিউলের পাল্লায় পড়ে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। কি আর করি! অনেকদিন পরে দেখা—তাছাড়া মেয়েটার সম্বন্ধে আমার একটু সফ্ট্ কর্ণারও ছিল সেকালে—হা—হা—হা"।

ভবেশ বলিল—"তবু খান কিছু। অন্ততঃ এক গ্লাস সরবৎ—"

"খেতাম। সরবৎ কেন—আরও অনেক কিছু খেতাম—কিন্তু মিষ্টার আচারিয়ার ওখানে আমার আবার আজ নেমন্তন্ন যে। জেপ্যানো এশিয়াটিক্ সেফ্‌টিপিন্ কম্পানি একটা ফ্লোট করবে নাকি—তারই

একজন পাণ্ডা হবার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করছে আচারি—যত সব ফ্যাসাদ জোটে আমারই ঘাড়ে। আমি আইডিয়ালিষ্ট মানুষ,'না' বলতে পারি না চট্ করে। আচ্ছা উঠি এবার—এক্সকিউজ মি—" মুখার্জ্জি চলিয়া গেলেন।

সেদিন আড্ডা ভাঙিতে অনেক রাত হইয়া গেল।

ট্রাম নাই—পদব্রজেই বাড়ী ফিরিতেছি।

একটু দূরে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে মনে হইল একটা লোক হাতে ঝোলান একটি ব্যাগ লইয়া মদনানন্দ মোদক ফিরি করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি মিষ্টার মুখার্জ্জি। ডান হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়া 'চাই মদনানন্দ মোদক' বলিয়া মাঝে মাঝে হাঁক দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কিন্তু অপ্রতিভ হইলেন না। সপ্রতিভভাবেই বলিলেন—"জিনিষটা ভাল, কিন্তু আমি নিজে উপকার পেয়েছি বলে সাধারণ পাঁচজনের উপকারের জন্যে এই ব্রত গ্রহণ করেছি। হজমির এমন ওষুধ আর হয় না। দেখবেন একটু খেয়ে?"

আমি নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলাম।

আমার চমক ভাঙিল যখন মিষ্টার মুখার্জ্জি তাঁহার ডান হাত দিয়া সহসা আমার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"একটা অনুরোধ—এ কথা যেন বলবেন না কাউকে। সবাই হয়ত জিনিষটা ঠিক বুঝবে না—ভাববে হয়ত অভাবে পড়েই—"

বহুদিন কাটিয়াছে। মিষ্টার মুখার্জ্জিকে আর দেখি নাই। আর আমাদের আড্ডায় তিনি আসেন না।

খুড়ো

খুড়োর জন্য সকলেই চিন্তিত হইয়াছিলাম।

খুড়োর সহিত আমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। কিন্তু খুড়োর মত আপনার লোকও আমাদের বড় বেশী ছিল না। খুড়ো বয়সে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বড়। চুল গোঁফ পাকিয়াছে এবং পাকিয়া নিজেরাই বেকুব বনিয়া গিয়াছে। খুড়োর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

গ্রামের সকলেই খুড়ো-অন্ত প্রাণ।

একটি লোক ছাড়া।

তিনি খুড়ীমা।

আজ সকালে তিনি ঝাঁটা মারিয়া খুড়োকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। বিপন্ন খুড়ো চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

মাধব ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করিল—"খুড়ো, ব্যাপারটা কি বল ত?"

খুড়ো কিছুক্ষণ নীরব।

একটু পরেই কিন্তু খুড়োর চক্ষু দুইটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিলেন—"লেপ-তোষক ছিঁড়ে গেছে—তা আমি কি করব বল দেখি? পুরোনো জিনিষ ছিঁড়বে না?"

"বেশ তো, নতুন লেপ-তোষক করান আবার—"

"পাগল হয়েছিস্ তোরা! ওই লেপ-তোষকে বেশ চলে যাবে এ বছর। তা ছাড়া টাকাই বা কোথায়?…যা যা তোরা বাড়ী যা—

ওসব আমাদের নিত্যি লেগে আছে। একটু পরেই মিটে যাবে। বাড়ী যা তোরা—"

আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাড়ী গেলাম না।

খুড়ীমার কাছে গেলাম।

খুড়ীমা যাহা বলিলেন তাহা অপ্রিয় হইলেও সত্য।

গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি বলিয়া বলিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন ; লেপ-তোষক সম্বন্ধে খুড়োর ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারেন নাই।

"তোমরাই দেখ না বাছা—এই লেপ গায়ে দেওয়া যায়—না—এই তোষকে মানুষ শুতে পারে। সামনে এই দুরন্ত শীত—পোড়ার-মুখো নিজেই যে নিমুনিয়া হয়ে মরবে সে খেয়াল নেই। বললেই একটি মুখ হাসি হেসে বলবে—'ওতেই চালিয়ে নাও এ বছরটা।' ঝাঁটা মারি অমন হাসির মুখে—! কচি খোকা!"

লেপ-তোষকের অবস্থা দেখিলাম সত্যই জরাজীর্ণ।

নবাবগঞ্জের জমিদারের মৃত্যু হওয়ার পর হইতে খুড়োর অবস্থা সত্যই খারাপ হইয়াছে। নানা সদ্‌গুণের জন্য নবাবগঞ্জের জমিদার মহাশয় খুড়োকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত পাঁচ বিঘা লাখেরাজ জমি হইতেই খুড়োর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাঁহার জীবিত-কালে খুড়োর অন্যান্য অভাবও তিনি মিটাইতেন। তাঁহার পুত্র আধুনিক যুবক। এজাতীয় বাজে খরচ তিনি পছন্দ করেন না। আত্মসম্মানী খুড়োও নবাবগঞ্জের জমিদার-বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন।

খুড়ীমা কিন্তু মেয়েমানুষ—এত সূক্ষ্মতত্ত্বের ধার ধারেন না।

তাঁহার যুক্তি সহজ—শীত পড়িয়াছে—লেপ-তোষক চাই।

খুড়ীমার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

সকলে পরামর্শ ঠিক করিয়া ফেলিলাম—খুড়োকে এবার শীতে কষ্ট পাইতে দেওয়া হইবে না। দুই টাকা করিয়া চাঁদা দিলে লেপ-তোষক হইয়া যাইবে।

চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া গিয়া দেখি খুড়ো পাড়ার একদল ছেলের সহিত মহা-উৎসাহে গুলি খেলিতেছেন।

আমাদের দেখিলেন—"কি রে—আবার ফিরলি যে তোরা—"

"শুনুন"

খুড়ো উঠিয়া আসিলেন।

"কি ?"

তাঁহার হাতে কুড়িটি টাকা দিয়া বলিলাম—"আপনি আজই শহরে চলে যান। লেপ-তোষক তৈরি করিয়ে আসুন—"

"টাকা কোথা পেলি ?"

"সে পরে বলব এখন—এগারটায় 'বাস্' ছাড়বে—ওইতেই চলে যান আপনি—সন্ধ্যে নাগাত হোয়ে যাবে লেপ-তোষক—রাত ন'টার বাসে ফিরতে পারবেন। যান—"

"তার মানে—"

"না না, যান আপনি—ও লেপ-তোষকে এ বছর আর চলবে না। আপনি চলে যান—বুঝলেন ?"

খুড়োর হাতে নোট দুইটা গুঁজিয়া দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। একবার পিছু ফিরিয়া দেখিলাম—বিস্মিত খুড়ো নোট দুইটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

* * * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম খুড়ো নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরিয়াছেন। দেখিয়া আসা যাক—কি রকম লেপ-তোষক হইয়াছে। খুড়োর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

বাড়ীর কাছাকাছি যাইতেই শুনিলাম—খুড়ীমা তার-স্বরে চীৎকার করিতেছেন। ব্যাপার কি ?

আমি বাড়ী ঢুকিতেই খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—"দেখ ত ভাই—জিনিষটা ভাল হয়নি ? আঠারো টাকায় এমন জিনিষ কি পাওয়া যায় ?"

দেখি খুড়ো একটি সেতার হাতে বসিয়া আছেন।

অক্ষমের আত্মকথা

সে যেদিন আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল, সে দিনের কথা আমি ভুলি নাই। অনিন্দ্যসুন্দর তাহার মুখখানি আমার বুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার সে কি কান্না! কোন কথা নয়—খালি কান্না! অন্ধকার ঘর! সূচীভেদ্য অন্ধকার!—সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে সে আর আমি একা! আর কেহ নাই। তাহার অশ্রুজলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত অন্ধকার থম্-থম্ করিতেছে।

আমি নির্ব্বাক্।

* * * * *

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন অন্ধকার নয়—সেদিন জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া যে উন্মাদনা সে প্রকাশ করিয়াছিল তাহারও ভাষা নাই। তাহার বুকের স্পন্দন আমি শুনিয়াছিলাম। উন্মত্ত সে স্পন্দন। তাহার স্পন্দিত বক্ষ আমার সর্ব্বাঙ্গে যে শিহরণ তুলিয়াছিল তাহা তাহাকে বলি নাই। বলিলেও সে বুঝিত না। বলিলেই কি লোকে সব কথা বোঝে? তাহা ছাড়া আমি বলিতেই পারিতাম কি?

* * * * *

আর একদিনের কথা।

সে উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। আমি পাশেই ছিলাম। নির্জ্জন দ্বিপ্রহর। সে একখানা বই পড়িতেছিল। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম তাহাকে। কি অপূর্ব্ব তাহার দেহখানি—যেন প্রস্ফুটিত একটি

শতদল! পরিপূর্ণ যৌবন-নদী দেহের কূলে কূলে উদ্দাম হইয়াছে। বেশ-বাসের আবরণ তাহাকে আর যেন ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ওই তুচ্ছ শাড়ীটা তাহার যৌবন-স্পর্শ পাইয়া নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে। টক্‌টকে চওড়া লালপাড়টা মর্ম্মান্তিক রকমের লাল। অন্যমনস্ক হইয়া সে হাতটা একবার আমার উপর রাখিল। আমার সমস্ত শরীরে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল তাহা সে বুঝিল কি?

বুঝিল না।

আমারও বলিবার ভাষা ছিল না।

* * * * *

কোন দিন তাহাকে কিছু বলি নাই। অথচ তাহার নিত্যসঙ্গী ছিলাম। তাহার সুখ, তাহার দুঃখ, তাহার উত্তেজনা, তাহার অবসাদ সবই অনুভব করিতাম। সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। সে কিন্তু একদিনও, এক নিমিষের জন্যও আমার কথা ভাবিত না।

ভাবিত না, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ভাবিবে কেন?

মানবী ছলনাময়ী!

* * * * *

অবশেষে সে আসিল।

যাহার আশায় তাহার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, যাহার বিরহে তাহার নয়ন-পল্লবে অশ্রু নামিত, যে পাওয়া-না-পাওয়ার সন্দেহ-দোলায় এত দিন দুলিতেছিল, সে একদিন সশরীরে বরবেশে

আসিয়া অবতীর্ণ হইল এবং তাহাকে অধিকার করিল।

অমি কিছু বলিলাম না। আমার চোখের সম্মুখেই তাহাদের প্রেম-সম্মিলন নীরবে দেখিলাম।

পৃথিবীতে এইরূপই হইয়া থাকে।

আমি দেখিতে কেমন জানি না। হয়ত খারাপ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার প্রাণ আছে—আমিও অনুভব করি। আমি দেখিতে খারাপই ত! আমার সারা গায়ে ময়লা! যদিও সপ্তাহ-অন্তর আমার বহিরাবরণ একবার করিয়া বদলানো হয় তবু একথা লজ্জার সহিতই স্বীকার করিতেছি, আমার অঙ্গ মলিন। তেল-চিট্‌চিটে ময়লা। কেন? তাহার উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলিতে পারি যে, আমি অক্ষম। কল্পনায় আমি বিলাসী—কিন্তু কি করিব, আসলে আমি যে বালিশ। ছোট তাকিয়া মাত্র! আমার কোন হাত নাই। তাহার দুঃখের অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভিজিয়াছে, সুখের স্পন্দনে সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছে, তাহার গোপন প্রেমলিপিকা সে নির্ভয়ে আমারই তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—তাহার অন্তরের সমস্ত নিগূঢ় বার্ত্তাই আমি জানিতাম—তবু সে আমাকে হেলায় ত্যাগ করিল এবং বরণ করিল মানুষকে!

তাহার কতটুকু সে চেনে!

"ক্যান্‌ভাসার"

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল সেই সময়টিতেই ক্যান্‌ভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি সৌখীন শাড়ী কেনার সখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে সখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে সে এই স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিষটা সে অপছন্দ করে এবং এই সব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং—

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোক-বাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলিলেন—"যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?—"

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দ্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্য্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস করিয়া একটা দাঁতন ভাঙ্গিল।

"মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—"

ভৈরব ফিরিয়া দেখে একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট স্যুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যান্‌ভাসার হীরালাল।

ক্যান্‌ভাসার হীরালালের এই পল্লীগ্রামে আসিবার কথা নয়। তাহার সহরে যাইবার কথা। যাইতেওছিল—কিন্তু ট্রেণে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'ওভারক্যারেড' হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেণ নাই। যদি কিছু 'বিজ্‌নেস্' হয় এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দ্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল—"আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশাই ?"

"মাজন আছে—ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভাল হয়ে যাবে মশাই— ভাল মাজন আছে—"

"তা তো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে ? এই পাড়াগাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো—"

"ব্যবহার করে দেখুন—ভাল মাজন—"

নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল—"কচু"—

হাসিয়া হীরালাল বলিল—"আজ্ঞে না—ভাল মাজন। ব্যবহার করে দেখুন—"

হীরালালের ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল, “আপনার দাঁতগুলি তো খাসা—এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?”

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ—”

ভৈরব একবার পিচ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

“মাজন নেবেন কি এককৌটা?”

বিকৃত-মুখ ভৈরব বলিল—“সরে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত সৌখীন বাজে জিনিষ জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন?”

বলিয়া সে নির্ব্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল, “বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।”

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল—“তাতে আপনার কি? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে! ওসব মাজন ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না।”

হীরালাল ক্যান্‌ভাসার হইলেও রক্ত-মাংসের মানুষ। সুতরাং বলিল, “আপনিই কি এই গ্রামের মালিক?”

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য, তাহার পেটে বিদ্যা নাই তাহা সত্য—কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে

কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এই সব জুয়াচোর-গুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীগুলিকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানই দুষ্কর—দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ্ ফেলিয়া ভৈরব কহিল—“বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে!”

“গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশাই আপনি শুনি?”

ভীম গর্জ্জনে ভৈরব কহিল—“বেরিয়ে যান—”

“আপনার মত ঢের মিঞা দেখেছি মশাই—”

ইহার পরই ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্য্যজনক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই! গরীব মানুষ—এই করে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—”

হতভম্ব নির্ব্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে সে বলিল—“আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন—”

বৈষ্ণব-শাক্ত

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী—অসম্ভব ভীড়।

তথাপি কিন্তু এক কোণে গাদাগাদি করিয়া বসিয়া পরম শাক্ত কালীকিঙ্কর বর্ম্মা পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামীর সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ক তর্ক করিতেছিলেন। বর্ম্মার কৃষ্ণ বর্ণ, রক্ত চক্ষু, কপালে টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ। গোস্বামীর গৌর বর্ণ, ধপধপে সাদা আবক্ষ গোঁফ দাড়ী—চোখে নীল চশমা। খাঁড়ার মত নাকের উপর শ্বেত-চন্দনের তিলক।

মাথা দোলাইয়া গোস্বামী বলিলেন—"যাই বলুন আপনি, ধর্ম্ম-সাধনের প্রশস্ত পথই হ'ল প্রেমের পথ। রক্তারক্তি করাটা একটা পৈশাচিক কাণ্ড। মানুষে ও পারে না—পারা উচিতও নয়—"

অট্টহাস্য করিয়া বর্ম্মা বলিলেন—"রক্তারক্তির আপনি বোঝেন কতটুকু শুনি? পৈশাচিক কথাটা যে ব্যবহার করলেন, পিশাচ দেখেছেন কখনও? মুণ্ডমালিনী মহাকালীর কোন ধারণা আছে আপনার?"

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট, মশাই! ওর বেশী ধারণা আমি করতেও চাই না। ছেলেবেলায় পাঁঠাকাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম—"

এমন সময় ঘচাং করিয়া ট্রেণটা থামিল। গোস্বামী মহাশয় টাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া বর্ম্মা মহাশয়ের ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন।

বর্ম্মার কপালের সিঁদুর গোস্বামীর নাকে লাগিল।

ষ্টেশনে শশা ফেরি করিতেছিল। বর্ম্মা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া

কিছু শশা কিনিলেন। একদল যাত্রী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে নিতান্ত স্থানাভাব। সমাগত যাত্রীবৃন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে যাত্রীটি দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড মাদল ঝুলিতেছিল। ট্রেণ ছাড়িলে গাড়ীর ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে মাদলের এক প্রান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাসাগ্রে আন্দোলিত হইতে লাগিল। দুই একবার ঠোকাও লাগিল। মাদল খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা সুখকর নহে। গোস্বামী মহাশয় তাহা বুঝিয়া মৃদুকণ্ঠে মাদলধারীকে কহিলেন—"একটু যদি সরে দাঁড়াতে বাবা দয়া করে'—"

কিন্তু দয়া করিতে সম্মত হইলেও লোকটির সরিবার উপায় ছিল না। নিরুপায় গোস্বামী তখন নিজের মাথাটাই যথাসম্ভব সরাইয়া মাদল-আন্দোলন হইতে নিজের নাসা-রক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর মাথার তির্য্যক্ ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বর্ম্মা মহাশয় বলিলেন—"তোমরা বসে পড় না হে! দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে বাপু! যে যেখানে আছ বসে পড়।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাদলধারী বসিল।

নাসা-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয় আবার সুরু করিলেন—"এই যে মাদল—অপূর্ব্ব জিনিষ এ! বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও অপরিহার্য্য অঙ্গ হচ্ছে খোল আর খঞ্জনী। আপনার ধর্ম্মে দেখান দিকি এমন জিনিষ। আপনারা এক রক্তারক্তি ছাড়া—"

নাকের উপর ঠকাস্ করিয়া আঘাত দিয়া মাদল-বাদক আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে পারিল না। বর্ম্মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আবার দাঁড়ালে কেন গো—"

"আজ্ঞে পরের ইষ্টশনেই নামব।"

"সে ত এখন দেরী আছে—"

মাদল-বাদক কিন্তু আর বসিল না। পরের ষ্টেশন পর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাকের সামনে মাদল সমানে আস্ফালন করিতে লাগিল।

পরের ষ্টেশন আসিল। গাড়ী ঘচাং করিয়া থামিতেই মাদলটা সজোরে গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নাকে লাগিল। একটুর জন্য চশমাটা বাঁচিয়া গেল।

ট্রেণ থামিলে হুড়মুড় করিয়া প্রায় সকলেই নামিয়া গেলেন। রহিলেন শুধু বর্ম্মা আর গোস্বামী। বর্ম্মা বলিলেন—"এ হে হে হে—আপনার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল যে! মাদলের আঘাতে বৈষ্ণবের রক্তপাত! একি বিড়ম্বনা!"

নাকটা মুছিয়া গোস্বামী বলিলেন—"আসল জিনিষ কি জানেন মশাই? অর্থ! পয়সা নেই বলেই না এই থার্ড ক্লাসে ভীড়ে চড়েছি—তাই না এ দুর্দ্দশা! অর্থ না থাকলে ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছু টেকে না!—"

অট্টহাস্য করিয়া শশা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বর্ম্মা মহাশয় বলিলেন—"যা বলেছেন! অর্থ নেই বলেই না আমার মত শাক্তকে ছুরি দিয়ে শশা কেটে খেতে হচ্ছে। খাবেন নাকি শশা?"

—"দিন্! সবই অদৃষ্টের রহস্য!"

সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের ষ্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শশা খাইয়া নামিয়া গেলেন তখন ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ বর্ম্মা মহাশয় জানিতেও পারিলেন না যে গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্দ্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র। অপর কেহ নন।

মাদলই ঠিক বুঝিয়াছিল।

অন্তর্য্যামীর কাণ্ড

ঘুম যখন ভাঙিল তখন রাত্রি গভীর।

বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলাম এবং চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বগতোক্তি করিলাম—"বাঁচা গেল!"—গাড়ী একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। যখন উঠিয়াছিলাম ভীষণ ভীড় ছিল। এখন আমি ত রাজা! একলম্ফে নীচে নামিয়াই—কিন্তু রাজত্ব ঘুচিয়া গেল। উপরন্তু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

বাঙ্কের ঠিক নীচেই একটি তরুণী বসিয়া।

একাকিনী।

আমার হাতে একখানা বই ছিল। বইটা বেঞ্চের উপর রাখিয়া অকারণে সোজা কামরাটার অপর প্রান্তে চলিয়া গেলাম এবং জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রহিলাম।

অন্তর্য্যামী মন কহিল—মেয়েটি সুবিধার নহে।

রাগ হইতে লাগিল। কোথা হইতে জুটিল এ?

গাড়ীটা খালি দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম গান গাহিব। যদিও আমি সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী নহি, কিন্তু ট্রেণে চড়িলে এবং চেনাশোনা লোক কাছে না থাকিলে আমি গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া থাকি। মেয়েটি যদিও চেনাশোনা নয় কিন্তু অন্তর্য্যামী মন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—ইহার সম্মুখে গান গাওয়া চলিবে না।

চোখে কয়লার গুঁড়া পড়িল।

মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইতে হইল। কয়লাক্রান্ত চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে দেখিলাম মেয়েটি আমার পুস্তকটি অধিকার করিয়াছে, পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছে এবং মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

অন্তর্য্যামী মন ভুরু নাচাইয়া বলিল—বলিয়াছিলাম ত। পরিচয় হইতে দেখিলাম মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। শাশুড়ীর অসুখ হওয়াতে স্বামীর টেলিগ্রাম পাইয়া যাইতেছে। সঙ্গে কোন লোক না থাকাতে ইচ্ছা করিয়াই ভীড়ওলা পুরুষমানুষদের গাড়ীতে চড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিল সকলেই মনে করিবে কেহ না কেহ একজন ইহার সঙ্গে আছে। গাড়ীটা একেবারে খালি হইয়া যাওয়াতে একটু মুস্কিল হইয়াছে। যাক্ পরের ষ্টেশনেই নামিব।

পরের ষ্টেশন আসিল।

মেয়েটি নামিয়া গেল। একা বসিয়া আছি। মেয়েটির কোন খুঁত ধরিতে না পারিয়া অন্তর্য্যামী মন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। এমন সময় চোখে পড়িল বেঞ্চির নীচে কি যেন একটা রহিয়াছে। মেয়েটি ফেলিয়া গেল নাকি? তাড়াতাড়ি টানিয়া বাহির করিলাম। ছোট একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। ভিতরে কাপড় দিয়া কি যেন ঢাকা রহিয়াছে।

কাপড়টা খুলিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম।

ভিতরে একটা মরা শিশু!

তাড়াতাড়ি বাক্সটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম।

ক্রূর হাসি হাসিয়া অন্তর্য্যামী মন বলিল দেখিলে ত!……পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিল।

ভাবিলাম নামিয়া যাই। উঠিতে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম খাকি হাফ্‌শার্ট হাফ্‌প্যাণ্ট পরা একটি লোক তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিলেন,

সঙ্গে একজন পুলিশ কনেষ্টবল! সর্ব্বনাশ! হাফ্‌প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"আরে বেকুব্—কাঁহা পর রাখ্‌খা।"

"ওহি ত বা,—বিরিঞ্চি্ কা নীচে—" বলিয়া কনেষ্টবল বেঞ্চির নীচে কেরোসিন বাক্সটা দেখাইয়া দিয়া নামিয়া গেল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমার নামা হইল না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম। তিনি দারোগা। ক্রমশঃ মৃত শিশুর ইতিহাসও শুনিলাম। দারোগা সাহেব শিশুটিকে তাঁহার এলাকায় কুড়াইয়া পাইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে একটি লোককে তিনি গ্রেপ্তারও করিয়াছেন। শিশুটিকে সদরে পোষ্টমর্টেম করাইবার জন্য যাইতেছেন। এই কনেষ্টবলের জিম্মায় জিনিষটা দিয়া তিনি সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ঘুমাইতেছিলেন। কনেষ্টবলটা এমন বেকুব যে একটা থার্ড ক্লাস কামরার বেঞ্চির নীচে ওটাকে রাখিয়া দিয়া নিজে বেশ ইণ্টার ক্লাশে ঘুমাইতেছিল। যদি নষ্ট হইয়া যাইত! একে ত এইরকমভাবে লইয়া যাওটা একটু বে-আইনি। অন্তর্য্যামী মন দেখিলাম মেয়েটির সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া দারোগা বেচারীকে লইয়া পড়িয়াছে এবং বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—বুঝিয়াছি ব্যাটা ঘুষ্-খোর কোথাকার—

স্ত্রী-চরিত্র

এক

গভীর রাত্রি।

মশারির মধ্যে শুইয়া শ্রীমতী সুনন্দা একটি মাসিক পত্রিকায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পাশেই শ্রীযুক্ত তমালকান্তি পাশ-বালিশ জড়াইয়া ধরিয়া নাক ডাকাইতেছেন। বলা বাহুল্য হইলেও বলিব, উহারা স্বামী-স্ত্রী। এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। সন্তানাদি এখনও কিছু হয় নাই।

সুনন্দা রোজই এইরূপ করে—অর্থাৎ শুইবার সময় একখানা বাঙলা বই লইয়া মাথার শিয়রে আলো জ্বালাইয়া বিনিদ্র নয়নে পড়িতে থাকে। তমালকান্তিও রোজ এইরূপ করে অর্থাৎ নির্ব্বিবাদে ঘুমায়।

মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ সুনন্দার নজরে পড়িল একটা গল্পের নাম "গল্প নহে"! আশ্চর্য্য নাম ত। লেখকের নাম নাই। সুনন্দা পড়িতে সুরু করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ সুনন্দার মন নির্ম্মলা নাম্নী মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ছোকরাটির উপর সুনন্দার প্রথমটা রাগ হইয়াছিল, কিন্তু সে রাগও বেশীক্ষণ টিকিল না। বিশ্বনাথ যখন বিদায়কালে নির্ম্মলার দুটি হাত ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন সুনন্দার রাগও জল হইয়া গেল। বিশ্বনাথ নির্ম্মলাকে পাইল না—পাইল কাদম্বিনীকে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ—

বিশ্বনাথ নামক যুবকটি গ্রীষ্মের ছুটিতে মাতুলালয়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে অন্য কোন কাজ না থাকায় সে পুষ্করিণীতীরে গিয়া

আড্ডা গাড়িল। উদ্দেশ্য মাছ ধরা। একদিন ফাৎনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেচারা প্রায় অন্ধ হইবার জোগাড় হইয়াছে এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ফাৎনা ডুবিল এবং বিশ্বনাথ মরিয়া হইয়া প্রচণ্ড এক খ্যাচ্‌কা টান দিয়া বঁড়শি তুলিয়াই একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল!

"ওগো—মা গো—"

সচকিত বিশ্বনাথ পিছন ফিরিয়া দেখে বঁড়শি একটি কিশোরীর কাপড়ে গিয়া আটকাইয়াছে। বলা বাহুল্য কিশোরী আর কেহ নহে—নির্ম্মলা।

এই সুরু।

তাহার পর ভদ্রভাবে যত প্রকারে প্রেমালাপ করা সম্ভব তাহা ইহারা করিয়াছে এবং করিত যদি না বিশ্বনাথের মাতুল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। মাতুল মহাশয় তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্যাপারটাকে যৌবনসুলভ বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং প্রতিষেধকস্বরূপ কাদম্বিনী প্রয়োগ করিয়া বসিলেন।

বিশ্বনাথ প্রথমটা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বেচারা একা কি করিবে। সে বড় জোর মাতুলকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে কিন্তু সমস্ত সমাজকে ঠেকান তাহার সাধ্যাতীত। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ এবং নির্ম্মলা কায়স্থ। সুতরাং নির্ম্মলার হাত ধরিয়া ক্রন্দন করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিল না।

বেশ লিখিয়াছে গল্পটি। নির্ম্মলাব জন্য সুনন্দার ভারি কষ্ট হইতে লাগিল। আলো নিভাইয়া সুনন্দা যখন শয়ন করিল, তখন নির্ম্মলার দুঃখে একবিন্দু অশ্রু তাহার নয়নে টলটল করিতেছে। কি নিষ্ঠুর সমাজ!

দুই

তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে তমালকান্তি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে তুমুল কাণ্ড। বেচারা "ডেলি-প্যাসেঞ্জার"; সকালে উঠিয়াই স্নানাহার করিয়া আটটা সাতান্নর 'লোকাল' ট্রেণে আপিস চলিয়া যায় এবং সাতটা বিয়াল্লিশের 'লোকাল'-যোগে ফিরিয়া আসে।

সুনন্দার এমন ভাবান্তর ইতিপূর্ব্বে সে লক্ষ্য করে নাই। মুখখানি তোলো হাঁড়ির মত করিয়া সুনন্দা বসিয়া আছে। তমাল আসিয়া ঢুকিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল।

মুখে একটিও কথা নাই। জামা-জুতা ছাড়িতে ছাড়িতে তমাল ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপার কি!'

মিনিট পাঁচেক পরে এক পেয়ালা গরম চা হস্তে সুনন্দা প্রবেশ করিল। মুখ তখনও তোলো হাঁড়ি।

তমাল চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিল—"দেখ, আজ গাড়ীতে 'পুষ্পসুরভিসার' বলে একটা মাথার তেল বিক্রি করছিল। রোজই করে। কাল মনে করছি কিনে আনব এক শিশি। গন্ধটাও ভাল, আর আমাদের মল্লিক মশাই বলছিলেন যে মাথাও নাকি বেশ ঠাণ্ডা রাখে!"

সুনন্দা নীরবে বাহির হইয়া গেল।

তমাল বুঝিল গতিক সুবিধার নহে। হঠাৎ হইল কি! চা নিঃশেষ করিয়া তমাল বাহিরে গিয়া দেখে সুনন্দা তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত উলের মাফ-

লারটা লইয়া বুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তমাল হাসিয়া বলিল—"আজ এত গম্ভীর যে! সমস্ত মুখখানা আজ এমন থম থম করছে কেন? ব্যাপার কি!"

সুনন্দা আর আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিল না। বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—

"আমার কাছে সোহাগ জানাবার দরকার কি? যাও না তোমার নির্ম্মলার কাছে, যার হাত ধরে বিয়ের আগে কেঁদে বলেছিলে—আমার মন তোমায় দিয়ে গেলাম নির্ম্মলা! বিয়ে করতে চলল এই দেহটা। সমাজের নিষ্ঠুর হাড়-কাঠে বলি দিতে চল্লাম নিজেকে।"

বিস্মিত তমাল কহিল—"নির্ম্মলা কে! পাগল হয়ে গেলে না কি তুমি!"

সুনন্দা কিছু না বলিয়া "গল্পপ্রভাকর" নামক মাসিক পত্রিকাটি এবং সম্পাদকের চিঠিখানি স্তম্ভিত তমালের হস্তে তুলিয়া দিল।

সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছে—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'গল্প নহে' নামক গল্পটি এই মাসে প্রকাশিত হইল। এক সংখ্যা 'গল্পপ্রভাকর'ও আপনার নামে অদ্য পাঠাইলাম। গল্পটি প্রকাশ করিতে নানা কারণে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আর একটি গল্প চাই। ইতি—

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ তালুকদার।

বিদ্যুৎঝলকের মত তমালের মনে পড়িয়া গেল যে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গল্পটি সে "গল্প-প্রভাকরে" পাঠাইয়াছিল বটে। তাহার পর তমালের বিবাহ হইয়াছে, চাকরী হইয়াছে, সাহিত্য-চর্চ্চা সে বহুকাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই গল্পটির কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল! আজ হঠাৎ এ কি আকস্মিক বিপদ!

আমতা আমতা করিয়া তমাল বলিল—"ওটা একটা গল্প লিখেছিলাম বটে, অনেকদিন আগে। তাতে হয়েছে কি?"

"গল্প? তুমি ত নিজেই লিখে দিয়েছ "গল্প নহে"!"

তমাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"ওটা একটা—ইয়ে—ষ্টাইল—বুঝলে কি না—"

সুনন্দা কিছুই বুঝিল না। বুঝিতে সে চায়ও না। নির্ম্মলার ঠিকানাটা জানিতে পারিলে একবার গিয়া দেখিত মেয়েটি কেমন রূপসী। স্বামী যেরূপ লিখিয়াছেন ঠিক সেইরূপ কি না!

ঈর্ষ্যায় তাহার সমস্ত অন্তর পুড়িতে লাগিল। অথচ এই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই নির্ম্মলার দুঃখে সুনন্দার চোখে জল আসিতেছিল।

থিওরি অব্ রিলেটিভিটি

এক

জীবনে নিকটতম দুঃখটাই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলাম। আমার ধার আছে, গৃহিণী কুৎসিত, সামান্য কেরাণী-গিরি করিয়া খাই এবং তাহা লইয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াই, কলেজে আমার অপেক্ষা যে-সব সহপাঠী নিম্নস্তরের ছিল কর্ম্মজীবনে তাহারা কেবল মুরুব্বির জোরে উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে—এইপ্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপ দুঃখ আমার ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ এই বুড়ীটা। এই বুড়ী তাহার ময়লা শতছিন্ন দুর্গন্ধ কাপড়টা লইয়া আমার নাকের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে বাঁচি। জানালা দিয়া দেখিতে পাইতেছি সন্ধ্যার আকাশ বহুবর্ণে বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই বুড়ীটা না সরিলে··· আঃ কি মুস্কিল।

পীড়িতা মাসিমার অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা যাইতেছিলাম। মন্থর-গতি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ, গ্রীষ্মকাল এবং আমার টিকেট তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং যে কষ্টভোগ করিতেছিলাম তাহা দুঃসহ হইলেও ন্যায্য—এইজাতীয় একটা সান্ত্বনা মনে গড়িয়া তুলিতেছিলাম এমন সময় পিছন হইতে অর্দ্ধমলিন-পরিচ্ছদধারী এক ভদ্রলোক বলিলেন—

"রাস্তাটা থেকে সরে দাঁড়ান একটু। 'বাথরুমে' যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করবেন না। একটু সরুন দয়া করে'।"

যথাসাধ্য দেহ-সঙ্কোচ করিয়া ভদ্রলোককে পথ করিয়া দিলাম।

ভদ্রলোক 'বাথরুম' হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে বলিলেন—"এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? ওধারে চলুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওদিকে কি জায়গা আছে?"

"আহা চলুনই না—"

বুড়ীর সান্নিধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকের অনুসরণ করিয়া কামরাটির অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে প্রস্তাব করিলেন—"বসুন, আমার এই তোরঙ্গটার ওপরই বসুন। আসল 'ষ্টিল'—আপনার মত দশজন বসলেও এর কিছু হবে না।" তোরঙ্গটির চেহারা ভালই বলিতে হইবে। তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছু ছিল না। বস্তুত আমি সন্দেহ প্রকাশও করি নাই। তথাপি ভদ্রলোক বলিলেন—"আমাব জিনিষ ভাল না দিলে নিস্তার আছে ছগ্‌গন লালের। তার মুনিব হ'ল গিয়ে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

আমি ট্রাঙ্কটির উপর বসিয়া ছিলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া শুধু বলিলাম—"তাই নাকি?"

"তাই নাকি মানে? ছগ্‌গন লালের সাধ্য আছে আমাকে খারাপ জিনিষ দেয়? তার মনিব বৈজুপ্রসাদ হ'ল গিয়ে আমার খাতক।"

ভদ্রলোককে খুশী করিবার জন্য আমি আবার বলিলাম—"হ্যাঁ, সুন্দর মজবুত ট্রাঙ্ক আপনার। দেখতেও চমৎকার।"

ভ্রূযুগল উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাম কত হবে আন্দাজ করুন দেখি।"

নিরীহভাবে বলিলাম—"টাকা কুড়ির ত কম নয়ই। কত ?"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া উঠিলেন এবং হাসি শেষ করিয়া বলিলেন—"আপনার দোষ নেই—হয়ত আসল দাম ওই রকমই হবে। আমি গণ্ডা বারো পয়সা দিয়েছিলাম।"

সত্যই অবাক হইয়া গেলাম।

"বলেন কি ? বারো আনা ?"

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"তাও নিতে চায় না। ছগ্গনকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা টাকা দিয়েছিলাম, তার থেকেও চার-গণ্ডা পয়সা ফিরিয়ে দিলে !"

আমি আর কিছু বলিলাম না। ছগ্গন লালের মনিব বৈজুপ্রসাদ যখন ইহার করায়ত্ত তখন ট্রাঙ্ক লইয়া ইনি ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বলিবার কিছু নাই। বসিতে পাইয়াছি—বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন—"যদিও আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু লোকে আমায় খাতির করে খুবই। এই দেখুন না—" বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া বেঞ্চির নীচ হইতে এক জোড়া ব্রাউন রঙের ভাল ডাবি 'সু' বাহির করিলেন এবং স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন—"এর দাম কত হবে বলুন ত ?"

"পাঁচ ছ' টাকা ত মনে হয়।" ভয়ে ভয়ে বলিলাম।

"রায় মশায় কিন্তু আমার কাছ থেকে চার গণ্ডা পয়সার বেশী কিছুতে নিলেন না। কারণও অবশ্য আছে। রায় মশায়ের ছেলের চাকরিটা এক কথায় করে দিলাম কি-না। টম্সন সাহেবও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

চকিতের মধ্যে বুঝিলাম এই শীর্ণকান্তি ভদ্রোলোক সামান্য ব্যক্তি নহেন।···সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গাড়ীর বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল। আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক ঢুলিতেছেন। গাড়ীর অপর প্রান্তে দেখিলাম সেই বুড়ীটা বেঞ্চিটার উপর জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। স্বল্পালোকিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়ীটাকে অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দুই

"ওটা কি পড়ছেন ?"

"ও একটা মাসিক পত্র। একটা গল্প পড়ছি।"

ভদ্রলোক কোণে ঠেস্ দিয়া ঢুলিতেছিলেন। আমিও পকেট হইতে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছিলাম।

ভদ্রলোক হাই তুলিয়া টুস্‌কি দিতে দিতে বলিলেন—"কার লেখা ?"

"পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর।"

"মেয়েটি লেখে ভালই কিন্তু ওর লেখার চেয়ে ওর—"

"পান্নালাল চক্রবর্ত্তী মেয়েমানুষ নাকি ?"

ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মেয়েমানুষ শুধু নয় —একেবারে তন্বী—গৌরী—যুবতী !"

আমি সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিদ্যুতের মত একটা পুলকিত শিহরণে সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া উঠিল। পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর লেখা আমার ভাল গাগে। শুধু ভাল লাগে বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না,

তাঁহার লেখার আমি একজন ভক্ত-পাঠক। যেখানেই পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর লেখা দেখিতে পাই সাগ্রহে পড়িয়া ফেলি। সেই পান্নালাল মেয়েমানুষ! তন্বী—গৌরী—যুবতী!

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"টুনি ত এই সেদিনের মেয়ে! সেদিন পর্য্যন্ত ফ্রক পরে' বেণী দুলিয়ে বেড়িয়েছে। মেয়েটা ছেলে-বেলা থেকেই বেশ চালাক-চতুর। এক কথায় ওরকম মেয়ে আমি এদেশে বড় একটা দেখিনি—"

বলা বাহুল্য কৌতূহলী হইয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম?"

"ওর মত ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে, সাইকেল চালাতে, গান গাইতে, ফুটবল খেলতে পারে এরকম ছেলেই আমাদের দেশে কম আছে। ভূষণকে বলেছিলাম স্বাধীন দেশে জন্মালে ও-মেয়ে একটা রিজিয়া, এলিজাবেথ হ'ত। অন্তত পক্ষে একটা নামজাদা সিনেমা ষ্টার।

"ভূষণ কিন্তু বিয়ের জন্যে অস্থির হ'ল—"

উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভূষণ কে?"

"ভূষণ হল গিয়ে টুনির বাপ! বিয়ে দিলে তবে ছাড়লে। বিয়ের পর ও কলম ধরেছে। তাও একবার লেখার দৌড়টা দেখুন।"

ভদ্রলোক আবার ঢুলিতে লাগিলেন।

মনে হইল অস্ফুটস্বরে যেন একবার বলিলেন—"টুনি—পান্নালাল চক্রবর্ত্তী—হেঁ!"

একটা ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ থামিল।

আমার ঠিক সামনের বেঞ্চে একদল সাঁওতাল বসিয়াছিল, তাহারা সদলবলে নামিয়া গেল। আমি বেঞ্চটি খালি পাইয়া সটান গিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক কোণে বসিয়া ঢুলিতেছেন। উপরের বাঙ্কে একজন স্ফীতোদর ব্যক্তি নাক ডাকাইতেছিলেন। তাঁহার মুখ দেখা গেল না। অনুমান করিলাম, কোন মাড়োয়ারী হইবেন।

চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছি। বারংবার একটি কথাই মনে হইতেছে—পান্নালাল চক্রবর্ত্তী তন্বী—গৌরী—যুবতী!

তিন

ধপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বাঙ্কের সেই মাড়োয়ারীটি বাঙ্ক হইতে লাফাইয়া নামিয়াছেন, আর কিছু নয়। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। ভদ্রলোক মাড়োয়ারী নয়—বাঙালীই। খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা কৃষ্ণকায় ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন! সামলাইয়া লইয়া এক জোড়া বড় বড় সদ্য ঘুম-ভাঙা লাল চোখ মেলিয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রভাত হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখিলাম তোরঙ্গের মালিক সেই ভদ্রলোকও আর ঢুলিতেছেন না। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' লইয়া 'ওয়াণ্টেড' পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। আমি আর একবার শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। তথাপি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু চোখও খুলিতে হইল। ট্রেণ আসিয়া ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে দাঁড়াইল। চায়ের আশায় উঠিয়া বসিলাম এবং হাঁকাহাঁকি করিয়া মাটির ভাঁড়ে খানিকটা চা যোগাড় করিয়া ফেলিলাম।

খোঁচা-খোঁচা গোঁফের অধিকারী এবং তোরঙ্গের মালিক উভয়েই দেখিলাম চা লইলেন। পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপিত করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের মত এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পাৎলা ছিপছিপে চশমাধারী একটি যুবক আমাদের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আরে এ কি, পান্নালাল বাবু যে! কোথা যাচ্ছেন ?"

খোঁচা গোঁফের মালিক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"কোন্নগর।"

"দেখা হয়ে গেছে যখন তখন আর যেতে দিচ্ছি না আপনাকে। কোন্নগর ওবেলা যাবেন। এবেলা এখানেই নেমে যান। অনেকদিন সাহিত্য-চর্চ্চা করা হয়নি। এমাসের "কাহিনী-কুঙ্কুম" কাগজে আপনার 'চল্তি চাকা' পড়লাম। চমৎকার হয়েছে গল্পটা!"

স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি ?

কিন্তু না—থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে উবু হইয়া বসিয়া এক ভাঁড় বিশ্রী চা হস্তে স্বপ্ন দেখাও ত সম্ভব নয়। "চল্তি চাকা" গল্প আমিও কাল রাত্রে পড়িয়াছি এবং "কাহিনী-কুঙ্কুম" এখনও আমার পকেটে আছে।

সবিস্ময়ে শুনিলাম ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ও গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—"আপনিই প্রসিদ্ধ গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্ত্তী ?" ছিপছিপে ভদ্রলোক সগর্ব্বে বলিলেন—"হ্যাঁ, ইনিই।"

ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী বলিতে লাগিলেন—"নমস্কার, নমস্কার, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হ'ল। এতক্ষণ একসঙ্গে এলাম, পরিচয় ছিল না। আপনার ভক্ত-পাঠক একজন আমি। চললেন তা হ'লে ? আচ্ছা, নমস্কার।"

ছিপছিপে পাতলা ভদ্রলোকের সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্ত্তী নামিয়া গেলেন। ট্রেণও ছাড়িয়া দিল।

মাটির ভাঁড়টা জানালা দিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং ট্রাঙ্কের মালিকের দিকে রুখিয়া ফিরিয়া বসিলাম।

সংক্ষেপেই বলিলাম—"এটা কি রকম হ'ল ?"

"কোন্‌টা ?"

বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করিলেন।

"বাঃ—কাল রাত্রে আমাকে আপনি বললেন পান্নালাল চক্রবর্ত্তী একজন মেয়েমানুষ—তাকে আপনি চেনেন—অথচ—"

নির্ব্বিকারভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"আর কি কি বলেছিলাম ?"

"আর বলেছিলেন আপনার ওই ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা—"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন, "যিনি বলেছিলেন তিনি চলে গেছেন। আমি অন্য লোক।"

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলাম।

"অন্য লোক মানে ?"

অর্থাৎ আমার 'এ্যাংগল অব ভিশন্' মানে কিনা দৃষ্টিকোণ এখন একেবারে অন্যপ্রকার।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না—"

সহসা ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এক মুখ্ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা কতক্ষণ আর থাকবে বলুন! কাল নেশার ঘোরে মনে হয়েছিল হয়ত পান্নালাল চক্রবর্ত্তী মেয়েমানুষ—ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা। এখন নেশা কেটে গেছে, এখন দেখছি পান্নালালের গোঁফ আছে এবং মনে পড়েছে এই ট্রাঙ্ক ও জুতোর দাম যথাক্রমে সাড়ে তের ও পৌনে সাত টাকা দিয়েছিলাম। 'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি'—বুঝলেন না?"

বুঝিলাম এবং চুপ করিয়া রহিলাম।

হঠাৎ গাড়ীর অপর প্রান্ত হইতে শুনিলাম—

"আরে বাবুয়া তু কাঁহা⋯?"

চাহিয়া দেখি সেই দুর্গন্ধ বুড়ীটা আমাকে ডাকিতেছে।

রাত্রে অত বুঝিতে পারি নাই এখন চিনিলাম মাসিমার বাড়ীর পুরাতন দাই রুক্‌মিনিয়া। মাসিমারা যখন বেহারে ছিলেন তখন হইতে রুক্‌মিনিয়া মাসিমার বাড়ীতে আছে। ছুটিতে দেশে গিয়াছিল, মাসিমার অসুখ শুনিয়া আসিতেছে।

বুড়ীর কাছে গিয়া বসিলাম। বুড়ী 'মহাবীরজী'র নিকট পূজা চড়াইয়া আসিয়াছে—মাসিমা যাহাতে ভাল হইয়া যান। মলিন বসনান্তরাল হইতে মহাবীরজীর 'পরসাদ' বাহির করিয়া খাইতে দিল। সানন্দে খাইয়া ফেলিলাম।

'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি'ই বটে!

মুহূর্তের মহিমা

এক

দেখা যাক, এইবার কি করে !

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুরগন খাঁ হাতের গুলি পাকাইতে লাগিলেন। আসল নাম অবশ্য গুরগন খাঁ নয়, আসল নাম কালীকান্ত। কিন্তু গুরগন খাঁ নামেই প্রসিদ্ধি। কারণ তিনি পুরাকালে চন্দ্রশেখরে গুরগন খাঁর চরিত্র অভিনয় করিয়া বহু নরনারীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপর হইবে।

মুখে সূচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

তদুপযুক্ত গোঁফ।

রঙ বাদামি।

চক্ষু তীক্ষ্ণ।

বুকময় চুল।

—ইহা কিন্তু নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়।

আসল পরিচয়, গুরগন শাঁসালো শক্তিমান শিক্ষিত।

জমিদার।

অপত্নীক।

মাংসাশী।

দুই

শ্রীমতী নাম্নী যুবতীটির প্রতি গুরগন আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমতীর প্রেম কিন্তু ভিন্নমুখী।

তাহার একটি রোগা গরীব-গোছের ছোকরাকে পছন্দ।

গুরগনের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে থাকিতে ওই পিলে-রোগা ছেলেটা!

ঘৃণায় তাহার সর্ব্বাঙ্গের পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিত।

এক চড় মারিলে তাহার মুণ্ডটা যে কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু মুণ্ড উড়াইবার চেষ্টা গুরগন করেন নাই।

বরং ভদ্রভাবেই নানাপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন।

অর্থাৎ ভাঙা মোটা গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধিয়াছেন।

জমিদার নাগরা পরিয়াছেন,

স্নো ঘষিয়াছেন,

জুলফি পর্য্যন্ত রাখিয়াছেন।

কিন্তু অবিচলিতা শ্রীমতীর দৃষ্টি রোগা ছোকরাটির উপরই স্থির-নিবদ্ধ।

গুরগন আগুন হইয়া উঠিয়াছেন।

তিন

আজ বৈকালে শ্রীমতী আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ছিলও। কিন্তু সে থাকা না-থাকারই সমান।

গুরগন বেশ বুঝিতেছিলেন, তাহার মন পড়িয়া আছে সেই রোগাটার কাছে। গুরগন ডাকিয়াছেন বলিয়া সে আসিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে গুরগনের অবাধ্যতা করিয়া এ গ্রামে টেকা মুস্কিল।

হঠাৎ গুরগন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমতীকে তাঁহার চাই,

আজই চাই,

এখনই চাই ;

তাহা না হইলে—এই রিভলভার।

তাঁহার খুন চাপিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী হাস্য-দীপ্ত চক্ষে গুরগনের পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর সে ধীরে ধীরে বলিল, অত চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে যদি না পান, কি করবেন আপনি ?

ভীমগর্জ্জনে গুরগন কহিলেন, তিনুকে খুন করব।

তিনু মানে সেই রোগা ছোকরাটি।

শ্রীমতী বলিল, আচ্ছা তা হ'লে আমাকে ভাববার সময় দিন একটু। একা ভেবে দেখতে চাই। আপনি একটু ওঘরে যান। যাবার সময় কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে গুরগন কহিলেন, কতক্ষণ ভাবতে চাও ?

দশ মিনিট।

বেশ।

স্খলিতচরণে গুরগন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চার

দেখা যাক— এইবার কি করে!

স্ফীতপেশী গুরগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দশ মিনিট চিন্তার পর শ্রীমতী বলিয়া গিয়াছে যে, আজ রাত্রে সে আসিবে। ঠিক দশটার সময় যেন গাড়ী পাঠানো হয়।

ঘড়ির দিকে গুরগন চাহিয়া দেখিলেন—মাত্র নটা বাজিয়াছে। এখনও এক ঘণ্টা বাকি।

উঃ!

পিপীলিকায় দংশন করে নাই।

অধীর গুরগনের প্রণয়ীসুলভ অস্ফুট কাতরোক্তি।

হঠাৎ গুরগনের হাসি পাইল—ভয়ঙ্কর হাসি পাইল।

রোগাটার কি দশা হইবে? আহা বেচারী!

বেচারী?

দারুণ ক্রোধে গুরগনের দন্তগুলি কড়মড় করিয়া উঠিল।

স্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকা উচিত ছিল বাঁদরটার!

আবার দর্পণে গুরগন নিজের পেশীবহুল দেহটার পানে চাহিলেন।

মুখে স্মিত হাস্য।

পাঁচ

দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

গাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

ফরসা রুমালটাতে এসেন্স ঢালিতে ঢালিতে গুরগন সাগ্রহে প্রতীক্ষমাণ।

মনের অবস্থা ?

উপমা দিতে হইলে বলিতে হয়, যেন কেৎলিতে জল ফুটিতেছে।

সহসা গলির মোড়ে গাড়ীর শব্দ হইল।

দুইটা ঘোড়ার আটটা খুর যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছে।

থামিল।

সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে।

পর্দ্দার কাছে আসিয়া একটু থামিল, তাহার পর পর্দ্দা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

শ্রীমতী।

শ্রীমতীর মুখ দেখিয়া গুরুগনের উদ্যত প্রেম স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সজলকণ্ঠে শ্রীমতী বলিল, আপনার কথার উপর নির্ভর ক'রে এলাম। কি কথা ?

তিনুকে আপনি কিছু বলবেন না। বলবেন না তো ?

না।

দুই জনে মুখোমুখি হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত।

কয়েকটি অতি তীব্র মুহূর্ত্ত।

সেই কয় মুহূর্ত্তে কি ঘটিল জানি না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরগন বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া রহিল।

তাহার পর চলিয়া গেল।

চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরগনের মনে হইল, এ কি করিলাম ? হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম ?

তাঁহার কণ্ঠ দিয়া এ কে কথা কহিল ? কে এ ?

আশ্চর্য্য !

বিস্মিত হইয়া তিনি ঘোড়ার খুরের বিলীয়মান শব্দটা উৎকর্ণ হই শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীপতি সামন্ত

ট্রেণে অসম্ভব ভীড়।

তিল ধারণের স্থান হয়ত আছে কিন্তু মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবি-পোষাক-পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মটাময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্য্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যে ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপোলিয়ান নহেন। সামন্ত মহাশয় ত নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব সম্ভব হইল না। বারকয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেণযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে অবশেষে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিগত তিনরাত্রি মোটে ঘুম হয় নাই।

সর্ব্বেশ্বরবাবুর নাতিনীটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখে-পাতায় করিতে পারেন নাই।

কাল ত অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোকে পাখা নাড়িবে না ঘুমাইবে!

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন—ওরে দাঁড়া!

শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ান নহেন, তাহা ঠিক—কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্ত্তিমান পুত্র—যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎচমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড়-টুপি-পরিহিত ছোটবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—

"টেরেনে ত আজ্ঞে চড়াই দায়, হুজুর! যদি অনুমতি করেন, এই এক পাশটায় আমি চড়ে পড়ি—"

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

ষ্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্দ্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন—মূর্খলোক হয়ত বুঝিতে পারে নাই—তাই!

বলিলেন— ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো—

'ফাসটো কেলাস' চেনেন না এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন—"আজ্ঞে ওটাতে নয় এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে ত গদি মদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন—আমি বুড়ো মানুষ—গরীব লোক—আমার শরীরটাও খারাপ —বিশ্বাস করুন, হুজুর তিনরাত্রি ঘুম হয় নাই—"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া ছিলেন। তাঁহার মুখের এক প্রান্ত হইতে একটি ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোহর নহে।

পরণে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দিশি মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্য্যকভাবে বসানো কাচফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকের ডাণ্ডাটা নাই, সে দিকে সুতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা, চক্ষু দুইটি রক্তাভ—চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম্ম নির্লোম মুখখানি বিনয়গদগদ। মাথায় টাক। বর্ণ নাতি-ফরসা-কালো। হাতে থেলো হুঁকা।

ছোটবাবু বলিলেন—"এই সায়েবকে বল। ওঁরই চাকরের জন্য ও কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কি"—

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি সাহেবি পোষাক পরিহিত হইলেও বাঙ্গালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন—

"হ্যাট কান্‌ট বি! আই কান্‌ট এলাউ!" সামন্ত মহাশয় করযোড়ে বলিলেন—আমিও ত হুজুরের চাকরই—চাকর ছাড়া আর কি। অনুমতি যদি করেন দয়া করে—

এই বৃদ্ধের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর একবার তৃতীয় শ্রেণীগুলির দিকে চাহিলেন।

পায়দানে পর্য্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহারই মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে! অথচ—

সামন্ত মতি-স্থির করিয়া ফেলিলেন।

"শুনলেন হুজুর—এইটাতেই চড়লাম আমি কুরুকে পাঠিয়ে দেন—ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি! ওরে, আন্ আন্ এইটাতেই আন্ সব—ওহে কালীকিঙ্কর—শ্যামাপদ কোথায়—বাঞ্ছা,—ও বাঞ্ছা,—এই দিকে—এইখানেই চড়াও সব—"

হৈ হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা, কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটা বঁটী—একটা ছিপ—দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটুলি ও এক টিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্ষ্ট ক্লাসেই তুলিয়া দিল। কালীকিঙ্কর ও শ্যামাপদ পদধূলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঙ্কাকে বলিলেন—"তুই তাহলে ওই পাশের কামরাটায় থাক গিয়ে। তোরই মজা হল রে! তামাক টিকে সব গুছিয়ে রাখ—"

বাঙ্কা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

থেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফ্‌টাকে সশব্দে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ঘুমটা হওয়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর।—কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার—অনেক টাকার কেনা-বেচা কর্‌তে হবে—"

যথাসময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবি ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন, ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রু'র দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রু'র নির্দ্দেশ-মত নিজের যাবতীয় জিনিষ পত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবদ্ধ করিলেন।

যদি কেহ গণিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে।

তাহার পর পাঞ্জাবি ক্রু বাঙালী সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইওর টিকেট্ প্লীজ্।"

"মাই টিকেট্ ইজ ইন্ মাই স্যুটকেস্। প্লীজ্ টেক্ মাই ওয়ার্ড ফর ইট্।"

"আই কাণ্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড! মাই ডিউটি ইজ টু পাঞ্চ টিকেট্‌স্‌—"

অবশেষে দেখা গেল বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বেশীক্ষণ বচসা চালানো শক্ত।

সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা অসিয়াছিল—ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

এ আবার কি ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল! ঘুমাইতে আর দিবে না দেখিতেছি!

ভগবান বিরূপ হইলে কাহার বাবার সাধ্য ঘুমায়!

দুর্গা—শ্রীহরি— !

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল 'কুরু' যেন সাহেবটিকে বলিতেছে যে, বাঙ্গালী বাবুদের সে ভাল করিয়াই চেনে, সুতরাং—

সামন্ত মহাশয়ের চুল-হীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন।

"ও কুরু মশায়—বাজে কথার কচ্‌কচিতে আর কাজ কি! কটা টাকা লাগবে বলুন—আমিই দিয়ে দি—ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন"—

সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি!

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন—

"আপনিও ত হুজুর কোলকাতা যাচ্ছেন্। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধা মত—"

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর ক্রুর দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন—"কটা বাঙ্গালী আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুল্‌কে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপ্! দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি"—

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন।

বাঙ্গালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কিনা জানি না—কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।

শরীরের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সুখের বিষয় হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুণ্ড হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই। নারীধর্ষণকারী অক্ষতই রহিয়া যাইবে।

…ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন…দেশের নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার পৌরুষের মূল্য কি ?…সমস্ত ছাত্রজীবন নানাবিধ ব্যায়াম করিয়া হাতের গুলি ও বুকের ছাতি বাড়াইয়াছি…কলেজের স্পোর্টে সকলের সেরা ছিলাম…কিন্তু শরীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কি লাভ যদি নারীত্বের মর্য্যাদা না রক্ষা করিতে পারি ?

ইত্যাকার নানারূপ যুক্তি মনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। করিলে কি হইবে—উপস্থিত কিছু করিবার উপায় নাই—এক উঠিয়া বসা ছাড়া। তাহাই করিলাম। উঠিয়া বসিলাম এবং জানালা দিয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরেও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মিটি-মিটি তারা জ্বলিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশের নক্ষত্রগুলা আমাদের দুরবস্থা

দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। অন্ধকারে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ওগুলো তালগাছ না প্রেতের দল! আমরা কি ভূতের রাজ্যে বাস করিতেছি!…দূরের পাহাড়টা অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট্ হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তু ঘাপ্‌টি মারিয়া বসিয়া আছে—সুযোগ পাইলে সমস্ত দেশটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

আবার খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িলাম। একজন অসহায় নারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে…ছি, ছি, ভাবিতেও সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে! দেশে কি পুরুষ নাই? সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায়—বহু সন্তরণশীল, ব্যায়ামশীল, লম্ফনশীল বীরপুরুষদের ছবি দেখি—ফুটবল, হকি খেলার সময় সমস্ত দেশের যৌবন চঞ্চল হইয়া ওঠে অথচ সেই দেশে এখনও নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হয় অবারিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে! আমরা জীবিত না মৃত! অভিভূতের মত বসিয়া রহিলাম।…ঝাঁং করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। পাশের লাইনে আর একটা গাড়ী আসিয়াছে। তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে-ষ্টেশনে নামিব তাহা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ষ্টেশনের আলো দেখা যাইতেছে। এ-দেশে আর কখনও আসি নাই। চাকুরীর চেষ্টায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পরিচিত একটি লোককে পত্র দিয়াছেন—তিনি চেষ্টা করিলে চাকুরী জুটিতে পারে।

দুই

এই শহরে ইতিপূর্ব্বে কখনও আসি নাই। বিহারের একটি শহর। রাত্রিও বেশ অন্ধকার। শ্বশুর মহাশয়ের পরিচিত সেই ভদ্রলোককে যদিও

আমি চিনি, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই অপরিচিত শহরে তাঁহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। ষ্টেশনে খোঁজ করিয়া শুনিলাম শহরের ভিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম—হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোঁজ করিব। একটি এক্কার সহায়তায় উক্ত হোটেলে আসিয়া পৌছান গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন—দ্বিতলে একটি কুঠরি দিলেন এবং সদাশয়তার আতিশয্যে একটি দড়ির খাটিয়াও দিলেন। যৎসামান্য আহার করিয়া সেই খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তিন

আবার কুরুক্ষেত্র-সমর বাধিয়াছে।

নারীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবদিগের ঘোর যুদ্ধ। স্বভাবতই পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি যথেষ্ট সুতরাং আমার পাণ্ডবপক্ষে থাকার কথা। কিন্তু কি রকম পাকেচক্রে পড়িয়া আমি ভীষ্মদেব হইয়া পড়িয়াছি। দ্রৌপদীধর্ষক দুঃশাসনের মোসাহেবি করিতে হইতেছে। একটি ঘুসিতে মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নাসিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার প্রবল বাসনাকে অপূর্ব্ব কৌশলে বাৎসল্যরসে রূপান্তরিত করিয়া ক্রমাগত হেঁ হেঁ হেঁ করিতেছি। অত্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতিকর ব্যাপার। …সহসা সমস্ত অপমানের যেন অবসান হইয়া গেল। আর দুর্য্যোধনকে দেখিয়া দেঁতো হাসি হাসিতে হইবে না—দুঃশাসনকে বাহবা দিয়া পিঠ চাপড়াইতে হইবে না—ধৃতরাষ্ট্রের মনস্তুষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার মৃত্যু সন্নিকট। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছি। শরশয্যা ফুলশয্যা নহে। তীক্ষ্ণ শরের সহস্র ফলার উপর

দেহভার রক্ষা করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। প্রতি রোমকূপে মৃত্যুর আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে। সহসা মনে হইল আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছি না! কানের পাশে, বগলের নিম্নে অসহ্য যন্ত্রণা! স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ-দেশেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট।···তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। টর্চ্চটা জ্বালিয়া দেখি সমস্ত বিছানায় যেন তিসি বিছান রহিয়াছে! অগুণ্তি ছারপোকা! দেওয়াল বাহিয়া সারি সারি আরও নামিতেছে। সর্ব্বনাশ! বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঘর ছাড়িয়া যাইব কি না ভাবিতে লাগিলাম।···অদ্ভুত স্বপ্নটার কথাও মনে হইতে লাগিল। আর একবার বিছানা ও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম।···একেবারে অক্ষৌহিণী!

চার

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলাম। বাহিরে চাহিবা মাত্র কর্ত্তব্য অচিরেই স্থির হইয়া গেল। আমি দ্বিতলের কুঠরি হইতে দেখিতে পাইলাম ঠিক নীচের গলিটাতে চেক্-কাটা লুঙ্গি-পরা একটি গ্যাঁট্টাগোঁট্টা-গোছের লোক একটি বাড়ীর জানালায় উঁকি দিয়াই চোরের মত সরিয়া গেল। যে-জানালায় লোকটা উঁকি দিয়া সরিয়া গেল, সেই জানালা দিয়া আমিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমার দ্বিতলের ঘর হইতে সহজেই তাহা সম্ভব। দেখিলাম একটি যুবতী শয়ন করিয়া আছে—পরনে একটি আধ-ময়লা কাপড়—কোলের কাছে একটি শিশু। ঘরে আর কেহ নাই।···চকিতের মধ্যে খবরের কাগজের সংবাদটা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর প্রচণ্ড বেগে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। লোকটাকে শিক্ষা দিতে হইবে! —সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে—এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহা জীবনে

সে আর কখনও ভুলিবে না। আমার ব্যায়াম-করা শরীরের প্রতি পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত গলিতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকটা আবার জানালার কাছে গিয়া সন্তর্পণে উঁকি দিতেছে। রাস্‌কেল্‌! সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলাম। একটি চপেটাঘাতেই বৎসকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব। আমার পদশব্দ পাইয়াই লোকটা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে চড় না মারিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম! আশ্চর্য্য কাণ্ড! কিন্তু উপায় কি! ইনিই আমার শ্বশুরের পরিচিত ব্যক্তি এবং আমার ভরসাস্থল। উদ্যত চপেটাঘাতকে কৃতাঞ্জলিপুটে পরিণত করিয়া মুখে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া বলিতে হইল, "আপনার কাছেই এসেছি—বিমল বাবুর জামাই আমি!"

ভদ্রলোক রসভঙ্গ হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ও, বিমল আমাকেও লিখেছে। কোথা উঠেছ তুমি?"

"ওই হোটেলে—"

"আচ্ছা—কাল সকালে দেখা ক'রো—"

ফিরিয়া আসিয়া সেই শরশয্যায় শয়ন করিলাম।

ভ্রষ্ট-লগ্ন

এক

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমার স্ত্রী। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পায়ের কাছে খানিকটা জমাট অন্ধকারের মত পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কি বলিব—কথা সরিতেছে না।

* * * *

অতীতের চিত্রগুলি মনে জাগিতেছে।

মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা যখন আমি স্কুলে পড়িতাম—যখন আমার কৈশোর পার হয় নাই—যখন স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের খাদ এত বেশী করিয়া মেশে নাই।

স্কুলের পরম বন্ধু ছিল তকু—অর্থাৎ ত্রৈলোক্য। বন্ধুত্বের ইতিহাসও আছে একটু। আমি থাকিতাম বোর্ডিঙে আর তকু থাকিত বাড়ীতে। এক পল্লীগ্রামের মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া আমি শহরের হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। ঠিক সেই বৎসরই সেই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল তকু। মুখচোরা ফরসা ছেলেটি। স্কুলের শিক্ষকগণ মেড়ার-লড়াই-দেখা মনোভাব লইয়া আমাদের উভয়ের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়—যাঁহার আগ্রহে আমি এই স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি

হইয়াছিলাম—একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওই তকুকে যেমন ক'রে হোক হটাতে হবে। পারবে ত ?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম মনে পড়িতেছে।

তখনও জানা ছিল না তকু কি বস্তু।

তকুকেও নাকি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় গোপনে বলিয়াছিলেন, "ওই ছেলেটিকে কিন্তু হারানো চাই। শুনছি বটে ভালো ছেলে—কিন্তু হাজার ভাল হলেও পাড়াগাঁ থেকে আসছে, ইংরেজীতে কাঁচা হবেই। তুমি চেষ্টা করলে ও কিছুতে তোমার সঙ্গে পারবে না—"

চেষ্টা করিলে তকু যে আমাকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিত এ-বিষয়ে এখনও আমি নিঃসন্দেহ! তকু কিন্তু চেষ্টা করে নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আমার মানরক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তকু ছিল কবি—সে কবিতা লিখিতে সুরু করিয়া দিল—অ্যালজেব্রা ও উপক্রমণিকা-মুখস্থ-করা ভাল ছেলে সে হইল না। তাহার কবিতাও এমন কবিতা যে তাহা আমার ফার্ষ্ট হওয়ার গৌরবকে নিস্প্রভ করিয়া দিল। নবোদিত দিবাকরের জ্যোতিতে ইলেক্‌ট্রিকের বাতি ম্লান হইয়া পড়িল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমি রহিলাম মানপুর স্কুলের ফার্ষ্ট বয় আর তকু হইতে চলিল বঙ্গসাহিত্যের একজন উদীয়মান কবি। তফাৎটা যে কি এবং কত বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

ফলে,—তকুর ভক্ত ও বন্ধু হইয়া পড়িলাম।

দুই

ক্রমশঃ বন্ধুত্বটা এমন এক পর্য্যায়ে উপনীত হইল যে স্কুলের সীমানার মধ্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। তকু একদিন আমাকে

বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তকুর মায়ের স্নেহকোমল ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিল—কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিল আর একজন। তকুর বোন। অসাধারণ তাহার রূপ। 'অসাধারণ রূপ' বলিতেছি কারণ চকচকে ধারালো সুন্দর একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। অমন সুন্দরী সত্যই আমি দেখি নাই। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। চোক মুখ নাক অদ্ভুত। একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল। গায়ের রং—সেও অতিশয় অপূর্ব্ব। চাঁপাফুলে গোলাপী আভা থাকিলে যাহা হইতে পারিত তাহাই। মনে হইতে লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পীর কল্পনা সহসা মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম তাহার ব্যবহারে।

বছর-দশেকের মেয়ে—অবাক হইয়া গেলাম তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া। আমার সহিত কথাই বলিল না! আচারে, ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে বেশ সুস্পষ্ট করিয়াই সে বুঝাইয়া দিল যে আমাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আমার সম্বন্ধে একবারে নির্ব্বিকার। মনে মনে আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল। চুপ করিয়া রহিলাম। বলিরার কি-ই বা ছিল। সে দিনটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

* * * *

তকুর বাড়ী প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। প্রায় প্রতি রবিবারেই। সুতরাং ক্রমশঃ কথা দু-একটা হইলই।

বেশ মনে পড়িতেছে প্রথম দিনই সে আমাকে বলিয়াছিল, "দাদাদের ক্লাসে আপনিই বুঝি ফাষ্ট´ বয়?"

সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, "হ্যাঁ—"

উত্তরে সে কি বলিল শুনিবেন ?

"বই মুখস্থ ক'রে ফাষ্ট সবাই হ'তে পারে। দাদার মতন অমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন আপনি ?"

মনে পড়িতেছে একটু সলজ্জ গলা-খাঁকারি দিয়া বলিয়াছিলাম, "আমি তোমার দাদার মত নই ত। হ'তেও চাইনি—"

"পারবেনই না—"

দশ বছরের মেয়ে !

তিন

দেখিতে দেখিতে চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এই চারি বৎসরে ত্রৈলোক্যের বাড়ী বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু মালতীর অর্থাৎ তকুর বোনের সহিত খুব অল্প কথাই হইয়াছে। যখনই যাইতাম দেখিতাম হয় সে আয়নায় মুখ দেখিতেছে—না হয় শাড়ীটি গুছাইয়া পরিতেছে—না হয় পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিতেছে—না হয় অমনি একটা কিছু। নানাভাবে সে আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। আয়নায় যখন সে চাহিয়া থাকিত মনে হইত যেন সে প্রণয়ীর মুখ-পানে চাহিয়া আছে। নিজের মুখখানির প্রেমে সে নিজেই পড়িয়াছিল। সে যে অদ্ভুত রূপসী এই সত্য কথা সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং একদণ্ডও ভুলিয়া থাকিত না।

তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল—মাদকতাও বাড়িতে লাগিল। আমার সে সদ্যজাগ্রত যৌবনে—বেশী বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না—আপনারা যাহা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিল। জীবনে সেই প্রথম প্রেমে পড়িলাম এবং সেই মেয়ের সহিত যে

আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই—যাহার ভাবে-ভঙ্গীতে কথায়-বার্ত্তায় আমার প্রতি অবজ্ঞাই অনুক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে! আশ্চর্য্য প্রেমের নিয়ম! আমি ঠিক তাহাদের পালটি ঘর ছিলাম, আমার ভাল ছেলে বলিয়া একটু সুনামও ছিল, মালতী যদি সামান্য একটু আশ্বাস দিত—বিবাহ আটকাইত না। কিন্তু আশ্বাস সে মোটেই দিল না। একদিন মনে পড়িতেছে তাহাকে আড়ালে পাইয়াছিলাম—মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিতভাবে একটু আমতা-আমতা করিতেছিলাম। আমার ভাব-গতিক দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিয়াছিল, "আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বলবেন না। নিজের চেহারাটা কখনও দেখেছেন আয়নায়?"

এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।...সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলের খেলার মাঠটাতে অনেকক্ষণ একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। ইহাও মনে পড়িতেছে যে অত বড় রূঢ় আঘাতের পরও মালতীর উপর বিতৃষ্ণা আসে নাই। বরং তাহার পক্ষ লইয়া নিজেরই সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। যাহার গর্ব্ব করিবার মত রূপ আছে সে তাহা লইয়া গর্ব্ব করিবে বই কি! রূপসী মাত্রেই গরবিণী। গর্ব্বটা সৌন্দর্য্যের একটা অলঙ্কার। অনেক তপস্যা করিয়া তবে সুন্দরীর মনের নাগাল পাওয়া যায়। এমনি কত কি যুক্তি।

আমি কিন্তু আর সময় পাই নাই। সেটা ম্যাট্রিক দিবার বছর। পড়াশোনায় কিছুদিন ব্যস্ত রহিলাম—তারপর পরীক্ষা দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতে হইল। মানপুরে ফিরিয়া যাওয়ার অজুহাত শীঘ্র আর পাওয়া গেল না।

চার

ইহার পর আরও চারি বৎসর কাটিল।

আমার উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেল—বাবা, মা মারা গেলেন। সংসারে আমার আর আপন বলিতে বিশেষ কেহ ছিল না। কলিকাতার মেসে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম। মালতীকে ভুলি নাই। ভোলা যায় না বলিয়াই ভুলি নাই। তাহাকে পাইবার আশা অবশ্য অনেকদিন ত্যাগ করিয়াছিলাম।

তকুর পত্র মাঝে মাঝে পাইতাম।

সে সাহিত্য-সাধনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে ম্যাট্রিকটা পর্য্যন্ত পাশ করিতে পারিল না। অথচ তাহা তাহার পক্ষে কতই না সহজ ছিল। তকুর বাবাও মারা গেলেন। তকুদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—আরও খারাপ হইয়া গেল। একদিন তকুর পত্র পাইলাম—লিখিয়াছে মালতীর জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান আমি যেন করি। পাত্রটি আর যা-ই হউক সুরূপ হওয়া প্রয়োজন, কারণ কালো বলিয়া দুইটি ভাল পাত্রকে মালতী কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। উত্তরে লিখিলাম, "ভাল পাত্রের সন্ধানে রহিলাম। জানাশোনা একটি ভাল পাত্র আছে—কিন্তু চেহারা তেমন সুবিধার নয়। মালতীর পছন্দ হইবে না। বল ত সম্বন্ধ করি।"

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

কোন উত্তর আসে নাই।

পাঁচ

আরও কিছুদিন কাটিয়াছে।

এম-এ পড়িতেছি। আশ্চর্য্য মানুষের মন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার

করিলাম যে মালতী কখন মন হইতে অতর্কিতে সরিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে আর একজন—মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী মিস্ মিত্র। আমার সহপাঠিনী।…আলাপটা হইয়াছিল লাইব্রেরীতে। এথিক্সের একটা অংশ-বিশেষ বুঝিয়া লইবার জন্য মিস্ মিত্র আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ। আলাপ সাধারণতঃ যেভাবে ঘনিষ্ঠতর হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। মিস্ মিত্র যে সুন্দরী তাহা নয়। কিন্তু তাহার চোখে মুখে এমন একটা মার্জ্জিত কমনীয়তা, এমন একটা সংযত মধুর বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেখিলাম যে মনে রং ধরিয়া গেল।…ক্রমশঃ দেখিলাম তাহার অনুপস্থিতিতেও আমি তাহার কথা চিন্তা করিতেছি, অজ্ঞাতসারেই তাহার চলাফেরা লক্ষ্য করিতেছি, কোন্ কোন্ রঙের শাড়ী পরিলে তাহাকে মানায় তাহা বিশ্লেষণ করিতেছি এবং কখন সে ক্লাসে আসিবে সেই আশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

ছয়

যখন মিস্ মিত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে—আর কয়েকদিন পরেই বিবাহ হইবে—এমন সময় তকু আসিয়া হাজির।

তকুর মুখে সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম!

বলিলাম, "সে কি সম্ভব?"

তকু বলিল, "সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই—সমস্ত খুলে বললাম। ওকে এখন আর কে বিয়ে করবে বল? অসাবধানে ষ্টোভ জ্বালাতে গিয়ে—ছি, ছি, কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। মা বললেন তোর কাছে আসতে। তুই ছাড়া কাউকে এ অনুরোধ করতেও সাহস পাই না যে!"—বলিয়া তকু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখে জল দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "না ভাই এখন আর সে হয় না। অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি। চল মাকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে বলছি—"

মানপুর গেলাম।

* * * *

পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রী বলিতেছে শুনিতেছি, "কক্ষণো তুমি আমায় ভালবাস না—কক্ষণো না। একদিনও বাসনি, বাসতে পার না। আমায় তুমি শুধু দয়া করেছ—কে তোমার দয়া চেয়েছিল—কেন তুমি দয়া করেছ—কেন—কেন—কেন—কেন—"

পাগলের মত বলিয়া চলিয়াছে।

"শোন—একটা কথা শোন—পায়ের উপর থেকে মুখ তোল—"

অশ্রুসিক্ত মুখ সে তুলিল।

মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ আগে যে দেখিয়াছে তাহার এ মূর্ত্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। বীভৎস পোড়া কদাকার! অসাবধানে ষ্টোভ জ্বালিতে গিয়া সমস্ত মুখটাই তাহার পুড়িয়া গিয়াছিল।

মিস্ মিত্রের খোলা চিঠিখানা কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।

ঘটনাচক্র

এক

শ্রীমতী উষা সেন আধুনিক মহিলা।

অর্থাৎ বি-এ পাস করিয়াছেন, ট্রামে, বাসে একাই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন, নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেই নানা দোকান ঘুরিয়া পছন্দ করিয়া খরিদ করিতে ভালবাসেন। অনাবশ্যক বেহায়াপনা বা লজ্জা কোনটাই নাই। সাহিত্যে অনুরাগ আছে। কোন্ লেখক ভাল, কোন্ লেখক মন্দ সে-বিষয়ে নিজের একটা স্পষ্ট মতামত আছে। চেহারা? সুন্দরী না হইলেও মোটের উপর সুশ্রী বলা চলে। আধুনিক বেশবাসে সজ্জিতা হইয়া তিনি যখন পথেঘাটে বিচরণ করেন তখন অধিকাংশ দর্শকই প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সংক্ষেপে, শ্রীমতী উষা—বেশ চটপটে, সুরুচিসম্পন্না আলোকপ্রাপ্তা ভদ্র তরুণী।

একটি বিষয়ে শ্রীমতী কিন্তু সাবেক-পন্থী। তিনি বিবাহ করিয়াছেন এবং সে বিবাহও আধুনিক রীতি ও রুচি অনুযায়ী হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য অন্নদা সেন—উষা সেনের বাবা। অন্নদাবাবু ভদ্রলোক সনাতন মতাবলম্বী। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার কন্যা মণীন্দ্রমোহন নামক একটি সহপাঠী কৈবর্ত্ত যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে তখন তিনি কালবিলম্ব করিলেন না। বংশ, কুল, কোষ্ঠী, গণ প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীমান ব্রজবিহারী গুপ্তের হস্তে শ্রীমতী উষাকে সমর্পণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ব্রজবিহারী বছরতিনেক হইল ডাক্তারী পাস করিয়া কলিকাতার রোগী-সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছেন। পাড়ি এখনও

তেমন জমে নাই। বিবাহের সময় উষা বাধা দিতে পারেন নাই। মনের সে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত মৃদু নরম মন। এই জন্যই আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পটাও সুগোপন সঙ্কল্পই রহিয়া গেল—কার্য্যে পরিণত হইল না। একটি প্রতিজ্ঞা কিন্তু উষা সেন মনে মনে করিয়াছিলেন, তাহা এই "—জর্জেট শাড়ী জীবনে আর কখনও পরিব না।" মণীন্দ্রমোহন জর্জেট শাড়ী অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং ভবিষ্যতে উষাকে ঐরূপ একটি শাড়ী কিনিয়াও দিবেন কথা ছিল—কিন্তু ব্রজবিহারীর অভ্যাগমে তাহা আর হইল না। সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং উষা সেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে জর্জেট শাড়ী জীবনে আর ছুঁইবেন না।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি—দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। শেষকালে এ প্রতিজ্ঞাও টিকে নাই। কি করিয়া ইহা ঘটিল তাহা লইয়াই এই গল্প।

দুই

পারুল-দিদি বেড়াইতে আসিয়াছেন।

পারুল মৈত্র উষা সেনের এক বছরের 'সিনিয়র' অথচ এখনও বিবাহ হয় নাই। বেশ-বিন্যাস প্রসাধন সম্বন্ধে তিনি উদাসীনা নহেন। এই বেশ-বিন্যাসের কল্যাণে তাঁহাকে উষার অপেক্ষা ছোটই দেখায়। নানা কথার পর তিনি বলিলেন, "এইবার উঠি ভাই, একটু মার্কেট যেতে হবে।"

"মার্কেটে কেন?"

পারুল-দিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন, "একখানা শাড়ী কেনার ইচ্ছে আছে। শুনেছি না কি জর্জেট শাড়ীগুলো আজকাল খুব সুন্দর উঠেচে।"

"তাই নাকি ?"

পারুল-দিদি চলিয়া গেলেন।

জর্জেট শাড়ীর কথায় উষার মণীন্দ্রমোহনকে মনে পড়িল। একটু দুঃখবোধও হইল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই দুঃখ হইল যে মণিকে না-পাওয়ার দুঃখের তীব্রতাটা যেন কমিয়া গিয়াছে। কই, মণির কথা আর ত সে তেমন করিয়া ভাবে না। দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে মণির কোন খবরই সে ত রাখে না আর! এখন সে মিসেস গুপ্ত এবং এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ব্রজবিহারীর সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে সে একান্তভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। মন অতীতের স্মৃতি ধ্যান করিতেছে না। স্পন্দনশীল বর্ত্তমানকে লইয়া সে ব্যস্ত। ব্রজবিহারী খারাপ লোক নয়, উষাকে খুশী করিবার জন্য তাহার চেষ্টার ক্রটি নাই, তদুপরি সে উষার স্বামী। সুতরাং তিলে তিলে সে উষার হৃদয় জয় করিয়াছে।

*　　　*　　　*　　　*

এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া উষা একটু আনমনা হইয়া পড়িল। মনে মনে অনর্থক একবার আবৃত্তি করিল—'তাকে আমি ভালবাসি। এখনও বাসি—জর্জেট আমি জীবনে কখনও পরব না—এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই।'

এই প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করিলেন তাঁহার সহোদরা ভগিনী সন্ধ্যা সেন। এখন অবশ্য সন্ধ্যা দাস। সন্ধ্যার স্বামী মিষ্টার দাস ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বলাবাহুল্য, ডেপুটি বাবুটি সদ্য-পাস-করা ডাক্তার ব্রজবিহারী অপেক্ষা ,অধিক উপার্জ্জনক্ষম। এই জন্যও বটে এবং পিঠাপিঠি বলিয়াও বটে উষার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। এখন অবশ্য

দু-জনেই বড় হইয়াছে, চুলোচুলি খামচাখামচি করিয়া ঝগড়া চলে না। বরঞ্চ মুখে দুই জনেই দুই জনের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। ইহাদের পাল্লা চলে এখন নীরবে—গহনা-কাপড়ের মারফৎ। উষা যদি সৌখীন দুল ক্রয় করিয়া কর্ণযুগল অলঙ্কৃত করিলেন সন্ধ্যা অমনি সৌখীনতর দুল দুলাইয়া উষাকে সৌখীনতমের সন্ধানে উতলা করিয়া তুলিলেন। সন্ধ্যা যদি কোন ছলে উষাকে জানাইলেন যে তাঁহার স্যাণ্ডাল জোড়াটার পাঁচ টাকা দাম, উষাকে অমনি জানাইতেই হইল—"হ্যাঁ, ওরকম স্যাণ্ডালগুলো বেশ,—আমার খুব পছন্দ। কিন্তু ওঁর কিছুতেই ওরকম ষ্ট্র্যাপ্-দেওয়া পছন্দ হয় না। নিজে পছন্দ করে এনেছেন দেখ না—সাড়ে ছ-টাকা দিয়ে! আঙুলগুলো এমন চেপে ধরে—বিচ্ছিরি!"

সুতরাং এই সন্ধ্যাই যখন উপর্য্যুপরি দুই দিন দুই বিভিন্নপ্রকার জর্জেট পরিয়া দিদির সহিত দেখা করিয়া গেল তখন উষা দেবী বেশ একটু বিচলিত হইলেন! জর্জেট কিন্তু তিনি পরিবেন না। মনে মনে কহিলেন, আহা ভারি ত জর্জেটের দাম! প্রতিজ্ঞা না করিলে এত দিন আমি কবে কিনতাম!"

* * * *

তৃতীয় বোমা হানিলেন বান্ধবী ছায়া।

ছায়া সিনেমায় যাইবে—উষাকে ডাকিতে আসিয়াছে। পরিয়া আসিয়াছে একখানা জর্জেট শাড়ী। সুন্দর সাদা রঙের জর্জেটখানা—সুন্দর কাজ-করা। উষা দেবী তাঁহার মুর্শিদাবাদীখানি সযত্নে পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতেই ছায়া প্রশ্ন করিলেন, "ওটা পরলি কেন এই গরমে! জর্জেট নেই তোর?"

"না।"

"আজকাল জর্জেটটার খুব চলন হয়েছে—কিনলেই পারিস একখানা। দামও ত বেশী নয়—আমার এইখানার দাম এগার টাকা—"

"মোটে ?" অতর্কিতে উষার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল !

মণীন্দ্রমোহনের স্মৃতিপটের সম্মুখে নানা বর্ণের কয়েকখানা জর্জেট শাড়ী আসিয়া পড়াতে পটখানা বেশ একটু আব্ছা হইয়া গেল। উষা কেমন যেন আনমনেই সিনেমাটা দেখিতে লাগিলেন। সিনেমার গল্পও একটা করুণ ব্যর্থ প্রণয়কাহিনী। এই গল্পের নায়িকাও যাহাকে প্রথম জীবনে ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহাকে পান নাই এবং যাঁহাকে পাইয়াছিলেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভালবাসিতেছিলেন। ইহাই জীবনের অদ্ভুত ট্রাজেডি। 'ইন্টারভাল' হইল—ইন্টারভালে উষা লক্ষ্য করিলেন যে মহিলা-দর্শকদের মধ্যে আরও দুই-একজন জর্জেট শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার নিজের মনেই তিনি নিজেকে বলিলেন, "আর একজনকে বিয়েই যখন করতে পেরেছি তখন আর জর্জেট শাড়ী পরতে কি ! জীবনে কতবার কত প্রতিজ্ঞাই ত করেছি—সব কি আর পালন করেছি—না, পালন করা সম্ভব ! যাক্, তবু জর্জেট আমি কিন্‌ছি না—"

* * * *

কয়েকটি দারুণ বোমার গুরুতর আঘাত সহ্ করিয়াও উষা দেবীর প্রতিজ্ঞা-দুর্গ ভূমিসাৎ হয় নাই। কোনরূপে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সেদিন 'চিত্রাঙ্গদা' দেখিতে গিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর যেন বোমাবর্ষণ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই জর্জেট শাড়ী। উষাকে জব্দ করিবার জন্যই যেন সকলে দল বাঁধিয়া জর্জেট পরিয়া আসিয়াছে।

তাঁহার মনে হইত লাগিল তিনি বোধ হয় একাই কাশ্মীরী শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং সকলে জর্জেট-বিহীন আবির্ভাব লইয়া মনে মনে হাসাহাসি করিতেছে।

শেষ বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইল একটি মোটর হইতে।

হঠাৎ সেদিন বিকালে উষা দেবী লক্ষ্য করিলেন যে একটি মোটর আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। মোটরে বসিয়া একটি জর্জেট-পরিহিতা তরুণী। সুন্দরী। দ্বিতলের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া উষা লক্ষ্য করিলেন যে মোটরটি দাঁড়াইতেই একমুখ হাসি লইয়া স্বামী ডিস্‌পেন-সারী হইতে বাহির হইয়া মোটরে চড়িয়া যুবতীটির পাশে বসিলেন। কে এ মেয়েটি? রোগিণী? চেহারা দেখিয়া ত মনে হয় না! উষা দেবীর দোষ দেওয়া যায় না—এ অবস্থায় কৌতূহল অদম্য হইয়া ওঠাই স্বাভাবিক।

স্বামী ফিরিতেই উষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বিকেলে যে মেয়েটি তোমাকে এসে নিয়ে গেল—কে ও?"

"হাসপাতালের একজন নার্স। ডক্টর বিশ্বাস আমাদের আজ একটা টি-পার্টি দিলেন কি না!— সুষি অর্থাৎ ওই নার্স টি বেশ মেয়ে!"

"মেয়েটি দেখতে বেশ। জর্জেট পরে বেশ মানিয়েছিল। কিনে দাও না আমাকে একখানা জর্জেট" —উষা বলিয়া ফেলিল!

"বেশ ত! দাম কত?"

"কত আর হবে! আজকাল সস্তাই হয়েছে শুনেছি। দশ-পনর টাকা হ'লেই হয়। ছায়া সেদিন প'রে এসেছিল একখানা, বললে এগার টাকা দাম। তাড়াতাড়ি নেই এখন—"

"আচ্ছা দেখি! আমার এক রোগীর কাছে ষোলটা টাকা বাকী আছে। কাল বিল, পাঠাব। টাকাটা যদি পাই কিনে দেব।"

তিন

ঠিক তাহার পর দিন সকালে বান্ধবী ছায়া আসিয়া দর্শন দিলেন। গোপনীয় কিছু বলিবার ছিল। মুখচোখ রহস্যময় করিয়া কানে কানে কহিলেন, "মণিবাবু কলকাতায় এসেছেন আজ ক'দিন হ'ল। আমি জানতাম না। মালতী তার এক বন্ধুর কাছে নাকি শুনেছে। দেখা করবি নাকি? ঠিকানা জোগাড় করেছি—এই নে। আমার কাজ আছে ভাই—বসতে পারব না। যা না, দেখা ক'রে আয়। দেখা করতে আর দোষ কি?"

ঠিকানাটি হাতে করিয়া ঊষা দেবী নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এত কাছে মণি আসিয়াছে! কলেজের অর্দ্ধবিস্মৃত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভীড় করিতে লাগিল। সেই অতীত দিবসগুলির মাদকতায় সমস্ত অন্তঃকরণ আবার যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। সেই ভীরু ভীতু মানুষটী—শান্ত নিরীহ, নিরহঙ্কার। মণীন্দ্রমোহনের মুখখানা সে যেন মনের ভিতর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।—নাঃ, জর্জেট শাড়ী আর সে কিনিবে না! স্বামী আসিলেই বারণ করিয়া দিতে হইবে।···মণিবাবুর সহিত একবার দেখা করিতে হইবে বই কি! হরিশ মুখার্জ্জির রোড কতটুকুই বা দূর!

* * * *

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই ঊষা দেবী বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ীটা

খুঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু ভিতরে গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই।

"আপনি আমাকে খবর দিলেন না কেন ?"

"আপনার ঠিকানা ত আমার জানা ছিল না। সেই যে আপনি কলেজ থেকে চলে গেলেন, আর ত কোন খবর দেন নি আমাকে। কার মুখে যেন শুনেছিলাম—আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায় কার সঙ্গে— কিছুই ত জানি না—" বলিয়া মণিবাবু একটু হাসিলেন। এমন সময়ে—"কেমন আছেন আজকে আপনি" বলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া ডাক্তার ব্রজবিহারী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন!

"এ কি, তুমি এখানে!"

উষা দেবীও কম বিস্মিত হন নাই।

"আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তুমিই এঁর চিকিৎসা করছ না কি ?"

* * * *

একটু পরেই ব্রজবিহারী বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে একটা কাগজের বাক্স দেখাইয়া বলিলেন—"ওই নাও তোমার শাড়ী। এই ভদ্রলোকের কাছেই টাকা বাকী ছিল। ভাগ্যে আজ দিয়ে দিলেন, তাই তোমার কাছে মানটা থাকল। দেখ ত রংটা পছন্দ হয় কি না—"বলিয়া ব্রজবিহারী নিজেই প্যাকেটটা খুলিতে লাগিলেন।

উষার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না।

কালো

ভয়ানক বদরাগী ছিল কালো।

এ লইয়া কত গল্পই যে প্রচলিত আছে!

সেবার স্কুলে সামান্য একটা পেন্সিল লইয়া সে কি কাণ্ড।

ঝগড়ার কারণ এত তুচ্ছ যে শুনিলে হাসি পাইবে।

মিত্তিরদের ছেলেটা নাকি কালোকে প্রশ্ন করে—

"তোর পেন্সিলের রংটা কেমন জানিস?"

"কেমন?"

"আমাদের বাঘা কুকুরের ল্যাজের যা রঙ্—অবিকল সেই রকম—" সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘুসি খাইয়া মিত্তিরদের ছেলে অজ্ঞান হইয়া যায়। স্কুলে মহা হৈ চৈ—

হেডমাষ্টার বলিলেন—"এমন গোঁয়ার ছেলেকে স্কুলে রাখা 'সেফ' নয়।" অনেক বলিয়া কহিয়া তবে হেডমাষ্টার মহাশয় সেবারকার মত তাহাকে ক্ষমা করিতে রাজী হইলেন। নামটা রহিয়া গেল।

* * * *

কিছুদিন পরেই কিন্তু আবার এক কাণ্ড।

এ ব্যাপারটাও হাস্যকর।

কিন্তু কালোর ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক।

ছেলেরা খাতায় শব্দরূপ লিখিতেছিল।

পণ্ডিতমশায় ঘুমাইতেছিলেন,—চেয়ারে ঠেস দিয়া এবং টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া—অর্থাৎ রোজই যেমন করেন।

হঠাৎ পণ্ডিতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখ-বোঝা অবস্থাতেই তাঁহার কানে আসিতেছিল পিছনের বেঞ্চি হইতে যে জাতীয় শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা ঠিক শব্দরূপ লেখার শব্দ নয়।

'খিক্—খিক্—খিক্—'

পণ্ডিত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবার সেই শব্দ—খিক্—খিক্—! কারণ কি অনুসন্ধান করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই কারণটি হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহার টিকিটি কে দড়ি দিয়া জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে।

পণ্ডিতের সন্দেহ হইল—এ কালোর কাজ।

কালো শপথ করিয়া বলিল যে সে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না।

পণ্ডিতের বিশ্বাস হইল না।

গেলেন তিনি হেডমাষ্টারের কাছে।

হেডমাষ্টার একটু পরেই বেত্র-হস্তে দর্শন দিলেন।

ক্লাশ-সুদ্ধ ছেলে বেত খাইল কিন্তু অপরাধীর নাম বলিল না। তখন প্রত্যেক ছেলেকে আলাদা ডাকিয়া ডাকিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় আপিস-ঘরে জেরা সুরু করিলেন।

এই জেরার মুখে পড়িয়া ফটিক নামক ছেলেটি ভয়ে ভয়ে যে উক্তিটি করিল হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত সেটি বিশ্বাস করিলেন। ইহাই তাঁহারা চাহিতেছিলেন।

কালো 'রাস্‌টিকিট' হইয়া গেল।

কালোর মত গুণ্ডা ছেলেকে ইস্কুলে হইতে দূর করিয়া দিয়া সমস্ত শিক্ষকের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু অন্ধকারে বোঁ করিয়া একখানা লাঠি আসিয়া লাগিল হেডমাষ্টারের পায়ে। ভদ্রলোক খোঁড়া হইয়া গেলেন।

নিষ্ঠাবান হিন্দু পণ্ডিত মহাশয়ের মাথা লক্ষ্য করিয়া কে একদিন একটা পচা মুরগীর ডিম ছুঁড়িয়া মারিল। সেই দরবিগলিত দুর্গন্ধ আমিষধারায় পণ্ডিতের নাক মুখ চোখ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা লইয়া আজিও অনেকে হাসাহাসি করে।

ফটিকের গালেও অন্ধকারে কে একদিন ঠাস করিয়া একটি চড় মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলের সন্দেহ হইল—কালো।

কালোর বাড়ীতে খোঁজ করা হইল। কালোর মা বলিলেন "কালো ত মামার বাড়ী গেছে—এখানে সে নেই ত—"

কথাটা অবশ্য মিথ্যা।

মরাইএর পিছনে বসিয়া বসিয়া মাতৃমুখনিঃসৃত এই মিথ্যা ভাষণটি কালো পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিল।

এইরূপে লেখাপড়া তাহার ইতি হইয়া গেল।

* * * *

বাড়ীতেও সে কি কম দৌরাত্ম্য করিত।

বিধবা মায়ের একটি মাত্র ছেলে।

পান হইতে চুণ খসিবার জো ছিল না।

একদিন তরকারীতে নুনই বুঝি একটু কম হইয়াছিল। ছেলের সে কি রাগ! লাথি মারিয়া ভাতের থালাটাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অমন সুন্দর কাঁসার থালাটার কানাটা ফাটিয়া গেল। আর একবার—জলে বুঝি একটু ময়লা ছিল—আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল গেলাসটাকে। সেটাও ভাঙিয়া পড়িয়া আছে কাঠের সিন্দুকটার ভিতর।

* * * *

তারপর আর একদিন।

কি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কি তুমুল কাণ্ড!

পশ্চিম দিকের সিঁদুরে গাছটায় সেবার আম আসিয়াছিল প্রচুর। টুক্‌টুকে লাল লাল আমগুলি—যেন আবীর মাখা।

কিন্তু ওই দেখতেই।

টক্—বিষ।

কালোই বলিত—"কাগ দেশান্তরি—বাঁদর বোবা—"

অর্থাৎ কাক যদি খায় দেশ ছাড়িয়া পালাইতে হইবে তাহাকে। বাঁদরের মত অম্ল-রসিকও যদি এ আম খাইতে সাহস করে বোবা হইয়া যাইবে। এমন আমের গুণ!

সেই আম গাছে একদিন কে একটা ছোঁড়া ঢিল মারিয়াছিল। কালোর নজরে পড়িয়া গেল।

কালো হাঁকিল—কে—রে—

ছোঁড়া ত দে ছুট!

কালোও ছুটিল।

বৈশাখ মাসের দুপুর বেলাকার কাঠ-ফাটা রোদ।

গ্রাহ্য নাই—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে কালো—ছোঁড়াটার পিছনে।

ধরিয়াই মার।

নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল ছোঁড়াটার।

তাহা লইয়া সে কি কাণ্ড! থানা-পুলিশ হইবার উপক্রম। গোটা দশেক টাকা খরচ করিয়া কালোর মা শেষে মিটাইয়া ফেলিল গোপনে।

* * * *

তারপর কালোর বিবাহ।

এই ত সেদিনের কথা।

সুন্দরী একটি ডাগর-ডোগর মেয়ে দেখিয়া কালোর মা কালোর বিবাহ দিলেন। বেশ বড় সড়—সুন্দরী বউ।

ভাবিলেন ছেলের সংসারে মন হইবে—আর দস্যিপনা করিবে না। ছেলের মন কিন্তু গেল অন্য দিকে।

শ্বশুর বিবাহের যৌতুক স্বরূপ একটি হার্ম্মোনিয়াম দিয়াছিলেন। ওই হার্ম্মোনিয়ামই হইল কাল।

দুনিয়ার যত বেকার ছোক্‌রা ওই হার্ম্মোনিয়াটাকে কেন্দ্র করিয়া আসিয়া জুটিল এবং গলা সাধিতে লাগিল।

ক্রমশঃ একটা সখের থিয়েটারের দল গড়িয়া উঠিল।

কালোর নাওয়া-খাওয়ার অবসর নাই।

থিয়েটারের মহড়া দিয়া কালো বাড়ী ফিরিতে লাগিল কোনদিন

বারোটায়—কোন দিন একটায়—কোন দিন তারও পরে। ছেলেমানুষ বউ বেচারি ভাত আগলাইয়া বসিয়া ঢোলে!

এক দিন বুঝি সে বলিয়াছিল—“একটু সকাল সকাল ফিরতে পারো না তুমি? একলা রাত্রে জেগে বসে থাকতে ভয় করে না আমার বুঝি!”

উত্তরে কালো তাহার চুলের ঝুঁটিটা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিয়াছিল—“ইস্—ভারি মনিব এসেছেন আমার!” বউটার কি সে কম নাকাল করিত!

* * * *

এমনই কত ঘটনা।

গ্রামের প্রত্যেকেই একটা দুইটা জানে।

কালোর বিরুদ্ধে সকলেরই একটা না একটা নালিশ ছিল। সকলকেই জ্বালাইত সে।

* * * *

আজ কিন্তু সকলে তাকে ক্ষমা করিয়াছে।

খোঁড়া হেডমাষ্টার, পণ্ডিত মহাশয়—এমন কি ফটিক পর্য্যন্ত।

বিধবা মা কালোর সমস্ত দুষ্কৃতিগুলি পরম স্নেহভরে আজ স্মরণ করিতেছেন। বউটি তার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানার স্মৃতিটিকে অশ্রু-সিঞ্চনে পরম মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

আর তো সে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে আসিবে না।

কাল রাত্রে সে মারা গিয়াছে—

হঠাৎ একদিনের জ্বরে।

বংশগৌরব

"জমিদার সূর্য্য চৌধুরীর কথা এখনও লোকে ভোলে নি, বুঝলে? শোন তবে একটি গল্প বলি। গল্প নয়—সত্যি কথা। নিজের চোখে দেখিনি—বাবার মুখে শুনেছি।

সবে তখন সিঙ্গাপুর জমিদারিটা কেনা হয়েছে। আসল জমিদার যিনি ছিলেন তিনি ত টাকা কড়ি নিয়ে চম্পট দিলেন বিলেতে। তিনি ছিলেন নীলকর সাহেব। তখন নীলকর সাহেবরা চাটি-বাটি গুটিয়ে সব সরে পড়ছেন। আসল জমিদার টম সাহেব চলে' গেলেন—কিন্তু তাঁর ম্যানেজার লং সাহেব আর নড়তে চায় না। সে ব্যাটা কুঠি দখল ক'রে ব'সে রইল। তাঁকে খবর পাঠান হলো।

ব্যাটা কি বললে জান?

বললে 'আমার ছ'মাসের মাইনে ছ'হাজার টাকা বাকী আছে। আমার মালিক টাকাটা তোমার কাছে নিয়ে নিতে বলেছে। টাকাটা পেলেই আমি চলে' যাব। জমিদারি কেনার সময় একটা সর্ত্ত ছিল যে, ম্যানেজারের বাকী মাইনেটাও দিয়ে দিতে হবে।'

সর্ব্বৈব মিথ্যে কথা—বুঝলে?

ব্যাটা এক জাল ডকুমেণ্টও বার করলে।

সকলের চক্ষু স্থির।

সূর্য্য চৌধুরী কিন্তু দমবার ছেলে নয়, তাঁর তখন চারটে হাতী, চোদ্দটা ঘোড়া—শতখানেক পালোয়ান, বরকন্দাজ। প্রবল প্রতাপ —বুঝলে?

তিনি ইচ্ছে করলে সেই দিনই ব্যাটাকে মেরে গ্রামছাড়া করতে

পারতেন। কিন্তু তাঁর সেই দিন মেজাজটা খুব ভাল ছিল। সেদিনই তাঁর নাতি হয়েছে—অর্থাৎ শর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেছে—"

বলিয়া বক্তা নিজের বক্ষঃস্থলে আঙ্গুল দিয়া টোকা দিলেন।

"তাই সে দিন তিনি আর মার-ধোর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে গেলেন না। ম্যানেজার বেহারী বাবুকে ডেকে বল্লেন 'ওহে, একটা কোন ফন্দি ক'রে লোকটাকে তাড়াতে হবে। এক কাজ কর, ব্যাটারা শুনেছি চা না খেলে টিকতে পারে না। এক কাজ কর—চা যাতে না খেতে পায় তার একটা ব্যবস্থা কর। বেশী কিছু করতে হবে না—গ্রামের সব গয়লাকে আজকে ডাকিয়া আনাও—সকলকে—'

ম্যানেজারবাবু গয়লাদের ডাকবার বন্দোবস্ত করতে বেরিয়ে গেলেন। ম্যানেজার বাবু চলে' গেলে তিনি তাঁর প্রিয় বরকন্দাজ শঙ্কর সিংকে ডেকে পাঠালেন। শঙ্কর সিং—দুর্দ্ধর্ষ জোয়ান, লম্বা প্রায় সাত ফিট—ইয়া বুকের ছাতি—ইয়া গালপাট্টা।

শঙ্কর সিং এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই তার উপর হুকুম হয়ে গেল—লং সাহেবের যত গরু মহিষ আছে—সব রাতারাতি হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশক্রোশ দূরে—আমদাবাদ খোঁয়াড়ে দিয়ে এসো। কাল সকালে সায়েবের গোয়ালে যেন একটি গরু মহিষ না থাকে—

শঙ্কর সিং সেলাম করে চলে গেল।

বিকেল নাগাদ সব গয়লারা এসে পৌছে গেল। আশ-পাশের দশখানা গ্রামের যত গোয়ালা ছিল—সব হাজির। ঠাকুরদা তাদের উপর কড়া হুকুম জারি করলেন যে, তাদের যত দুধ হয় সব তিনি কিনবেন—লং সাহেব যেন এক ফোঁটা দুধ না পায়:

যদি কেউ লং সাহেবকে এক ফোঁটা দুধ বিক্রি করে তা'হলে তাকে আর আস্ত রাখা হবে না। ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে জুতো মেরে তাকে জমিদারি ছাড়া করা হবে।

গোয়ালারা সমস্বরে বল্লে—'যো হুকুম—'

গোয়ালার দল চলে' গেল।

ঠাকুরদা ঘাড় নেড়ে বল্লেন—'চা খাওয়া বার করছি ব্যাটার—'

তার পরদিন লং সায়েবের কুঠিতে হুলুস্থুল ব্যাপার।

খানসামা এসে সেলাম ক'রে জানালে—'হুজুর দুধ কাঁহু নেই মিলত'—শুনে লং সায়েবের মুখখানা লং হয়ে গেল।

মেমসায়েব স্তম্ভিত।

মেম সাহেব ভীতু লোক ছিলেন। তিনি সাহেবকে অনুরোধ করতে লাগিলেন—মিষ্টার চৌধুরী শুনেছি ভয়ানক লোক। ওর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করা ঠিক নয়—

লং সায়েবের মুখ তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ।

বল্লেন—'ইউ কিপ কোয়ায়েট।'

বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

গেলেন থানায়।

জমিদার সূর্য্য চৌধুরীর নামে গরু-চুরির নালিশ করতে। গিয়ে দেখেন থানায় দারোগা নেই—সেই দিন ভোরেই—দারোগা সায়েব মফঃস্বলে 'টুরে' বেরিয়েছেন। কবে ফিরবেন তা জমাদার সায়েব বলতে পারলেন না।

দারোগা সায়েব ঠাকুরদার মহা-ভক্ত ছিলেন।

না হবেনই বা কেন?

তখনকার দিনে এমন কোন অফিসার ও'অঞ্চলে ছিলেন না যিনি ঠাকুরদার জমিদারির দই, দুধ, ক্ষীর, ঘি, মাছ না খেয়েছেন। আর তা-ও কি একটু আধটু। মণ মণ।

যাক—লং-সায়েব ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বিনা দুধেই খানিকটা চা গলাধঃকরণ করলেন। বেচারা!

তার পরদিন কিন্তু এক কাণ্ড ঘটল!

কে একজন এসে ঠাকুরদাকে খবর দিল যে সায়েব দুধ পেয়েছে।

সে কি? কে দুধ দিলে? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে।

তখখুনি চর ছুটল সঠিক সংবাদ আনবার জন্য। কিছুক্ষণ পরে চর এসে খবর দিলে—সে খানসামার কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে—সায়েব শহর থেকে টিনের দুধ আনিয়েছে। টিন ছ্যাঁদা করে তার থেকে দুধ বের করে চায়ের সঙ্গে গুলে খাচ্ছে।

ঠাকুরদা বল্লেন—'টিনের দুধ? সে কি?'

তখনও কনডেন্সড্ মিল্কের চলন হয় নি—বুঝলে?

ঠাকুরদা ত আকাশ থেকে পড়লেন।

টিনের দুধ? বলে কি।

যাই হোক সূর্য্য চৌধুরী দমবার ছেলে নয়।

বজ্র-নির্ঘোষে হাঁক ছাড়লেন—শঙ্কর সিং—

শঙ্কর সিং এসে হাজির হল।

ঠাকুরদা হুকুম দিলেন লং-সায়েব কুঠিতে বসে কি এক টিনের দুধ দিয়ে চা খাচ্ছে—এক্ষুনি গিয়ে সেই টিন কেড়ে নিয়ে এসো। যাও—

শঙ্কর সিং বেরিয়ে গেল।

পূরো চব্বিশটি ঘণ্টা সায়েব ভাল করে চা খেতে পায় নি। অবস্থাটা বোঝ একবার—প্রাণ একেবারে খাঁ খাঁ করছিল! টিনের দুধ শহর থেকে আনিয়ে বেশ বাগিয়ে স্বামী স্ত্রী বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। সকাল বেলা।

চায়ের টেবিলের ঠিক সামনেই—কাচের দরজা বন্ধ। চা খাওয়া চলছে, এমন সময় প্রকাণ্ড এক ঘোড়ায় চড়ে—টগবগ টগবগ করতে করতে শঙ্কর সিং এসে হাজির—হাতে প্রকাণ্ড এক বর্শা। তড়াক করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে শঙ্কর সিং সোজা সেই কাচের দরজার সামনে এসে হাজির হ'ল।

এসেই এক লাথি।

ঝনঝন করে দরজা ভেঙ্গে পড়ল।

বিদ্যুদ্বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দুধের টিন নিয়ে আবার বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গিয়ে শঙ্কর সিং ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সায়েব হতভম্ব।

মেম সায়েব মূর্চ্ছিত।

"সেই দিনই সায়েব তল্পি-তল্পা গুটিয়ে—"

এমন সময় বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

'ঘণ্টা বেজে গেল নাকি? আর নয় ভাই আমাদের সায়েব-ব্যাটা ভয়ানক ষ্ট্রিক্ট! একটু দেরী হলেই 'ফাইন' করে—'

এই বলিয়া বক্তা ত্রস্ত চকিত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি আপিসে ঢুকিয়া পড়িলেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের পৌত্র চরণ বাবু—বর্ত্তমানে সদাগরি অফিসে কেরাণীগিরি করেন।

খাসা গল্প বলিতে পারেন ভদ্রলোক।

ভূত

এক

জনশ্রুতি, দেবরাজ ইন্দ্রই বজ্রধর। কিন্তু জরাজীর্ণ বুড়া পিওনটাও যে বজ্র হানিতে সমর্থ তাহা সেদিন সকালে বোঝা গেল। সুষমার মস্তকে অনায়াসে সে একটি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে চলিয়া গেল।

পত্রখানা হাতে করিয়া নির্ব্বাক সুষমা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রশান্ত লিখিতেছে—

"আমার চিঠি পেয়ে তুমি কষ্ট পাবে জানি—কিন্তু তবু না লিখেও ত উপায় নাই। বিশ্বাস করো, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—কিন্তু বাবা, মা, ইন্টারকাস্ট বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী নন। এ অবস্থায় তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে বিয়ে করা অসম্ভব। যাঁরা আমাকে এত কষ্টে মানুষ করেছেন তাঁদের মনে এতবড় একটা আঘাত দিতে পারব না। তাঁদের আশীর্ব্বাদবঞ্চিত দাম্পত্য-জীবনও কি সুখের হবে? কি করব বল—এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভবপর হ'ল না। যদি পরজন্ম থাকে এবং সেই পরজন্মে যদি আমরা এক জাত হ'য়ে জন্মাই এবং এই জন্মের স্মৃতি যদি পরজন্মে জাগরূক থাকে তা হ'লে হয়ত আবার মিলন হবে।

তুমি রাগ কোরো না। আমার মনে যে কি হচ্ছে তা তোমায় বোঝাতে পারব না। আমার দুঃখের ভাষা নেই। এইটুকু শুধু সান্ত্বনা যে, তোমার জন্যেই আমি দুঃখ ভোগ করছি। দুঃখই প্রেমকে মহিমান্বিত করে। যদি সম্ভব হয় অল্প কয়েকদিন পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

ইন্দ্রের বজ্র কি ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ?

দুই

কিন্তু নিদারুণতর আর একটি বজ্র উদ্যত হইয়া ছিল।

সেটি পড়িল দুই দিন পরে।

সেই জরাজীর্ণ রোগা পিওনই সেটি ছাড়িয়া গেল।

ক্ষুদ্র পত্র—কিন্তু সাংঘাতিক সংবাদ।

প্রশান্ত আত্মহত্যা করিয়াছে।

সূর্য্য-সমেত আকাশখানা সুষমার চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল।

তিন

সুষমা মফঃস্বলের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী।

বিস্তৃত স্কুল কম্পাউণ্ডের এক ধারে তাহার ফ্রি কোয়ার্টার্স। সেই কোয়ার্টার্সে সুষমা ও আর একজন প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ বোস থাকেন। পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইজনে শয়ন করেন। মাঝে একটি পরদাবৃত দরজা।

গভীর রাত্রি।

হঠাৎ সুষমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আলুথালুবসনা মিসেস্ বোস পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। ব্যাপার কি?

জানালায় কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিসেস্ বোস মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন, নিশ্চয়ই সেক্রেটারী বাবুর বখাটে ভাইপোটা! ছোক্‌রার চাল-চলন,

আচার ব্যবহার বহুদিন হইতে মিসেস্ বোসের বিরক্তির কারণ হইয়া আছে। অথচ হাতে-নাতে ছোকরাকে ধরিবার উপায় নাই। সঙীন ধূর্ত্ত!

সুষমা মিসেস্ বোসকে কিছু বলিল না।

সে কিন্তু স্পষ্ট দেখিয়াছিল।

প্রশান্তর ছায়া-মূর্ত্তি।

অবিকল!

তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

চার

সুষমা খাট টানিয়া মিসেস্ বোসের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইল।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই।

মিসেস্ বোসের শয়নঘর হইতে স্কুলের পিছন দিক্‌কার অশ্বত্থ গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্রে কি ভীষণ ঝাঁকড়া দেখায় গাছটা! সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সুষমা সভয়ে দেখিল, ওই গাছটার নীচু ডালটাতে বসিয়া কে যেন পা দোলাইতেছে! অস্তমান চন্দ্রকিরণে ওই যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

প্রশান্ত!

সুষমা শিহরিয়া চক্ষু বুজিল।

* * * *

আর একদিন মনে হইল, বাগানের বেড়াটায় হেলান দিয়া কে যেন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!

তাহার চক্ষুতে ক্ষুধার্ত্ত সে কি দৃষ্টি!

চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার।

পাশের খাটে শুইয়া মিসেস্ বোস নাক ডাকাইতেছেন। সুষমার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রশান্তের প্রেত-দৃষ্টি যেন টর্চের আলোর মত তাহার অন্তর বিদ্ধ করিতেছে!

সে সভয়ে চক্ষু বুজিয়া মনে মনে রাম-নাম জপ করিতে লাগিল।

আর এক দিন সন্ধ্যার পর সে বেড়াইয়া ফিরিতেছিল।

গেটে ঢুকিতে যাইবে—মনে হইল, তার পাশ দিয়া সাঁৎ করিয়া সে চলিয়া গেল। হঠাৎ যেন গেটের পাশের ঝোপটায় মিলাইয়া গেল।

* * * *

জীবিতাবস্থায় যে প্রিয়তম ছিল—মরিয়া সে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা হইলেই সুষমার গা ছম্ ছম্ করে!

পাঁচ

সেদিন ছুটি ছিল।

মিসেস্ বোস ছিলেন না—ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। রাত্রে সুষমা ভাবিল করুণা দিদিকে (আর একজন শিক্ষয়িত্রী) পাশের কোয়ার্টার্স হইতে ডাকিয়া আনিবে। ডাকিতে গিয়া দেখিল করুণা দিদির আপত্তি নাই—কিন্তু মেনতুদির ঘোর আপত্তি! তিনি একা শুইতে পারিবেন না।

নিরুপায় সুষমাকে চাকরটার উপর ভরসা করিয়া একাই শুইতে হইল।

গভীর নিশীথে ললাটে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সচকিতা সুষমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

হিমশীতল স্পর্শ!

ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, একেবারে শিয়রে বসিয়া আছে।

চীৎকার…ফিট্!

কিছুক্ষণ পর সুষমা চক্ষু মেলিল।

স্বয়ং ভূত জলের ঝাপ্টা দিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভাঙাইতেছে।

সুষমার গলায় কেমন যেন একটা ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল। পেটের মধ্যে কি যেন একটা পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। ভূত্ কিন্তু নাছোড়!

ক্রমাগত জলের ঝাপ্টা দিয়া চলিয়াছে।

ছয়

পরদিনই সুষমা কাজে ইস্তফা দিয়া দিল।

গত্যন্তর ছিল না।

জিনিস পত্র গুছাইয়া অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিটাতে গিয়া সে যখন উঠিল তখন তার মুখ লজ্জারুণরঞ্জিত।

"ছি-ছি—া ক লজ্জা—"

"বাবা-মার যখন মত পেয়েছি তখন আর কাকে ভয়? ট্রেণটা পেলে হয় এখন! তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখ্ছিলাম্ আর কি!"

ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিল!

জগমোহন

এক

বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।

জগমোহন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চোখের ইঙ্গিত করিয়া বলিল—বাইরে শোন্!

বাহিরে উঠিয়া আসিলাম।

কি ?

কিছু নয়। একটা বিড়ি দে।

বিড়ি দিলাম।

জগমোহন কখনও বিড়ি কিনিয়া খায় না। চিরকাল সে পরস্মৈপদী ধূমপান করিয়া আসিতেছে। বন্ধুবান্ধব মহলে জগমোহনকে বিড়ি দেওয়াটা একটা রেওয়াজের মত হইয়া গিয়াছে।

নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে জগমোহন বলিল,—

বিপ্‌নের আদিখ্যেতার কথা শুনেছিস? সে গোঁফ কামাতে রাজী নয়।

সংবাদটা উড়াইয়া দিবার মত নহে।

কারণ বিহার বন্যায় অর্থ সাহায্য করা যে নাট্যাভিনয়ের উপর নির্ভর করিতেছে সেই নাটকের প্রধান নায়িকা বিপিন।

বলিলাম,—আগে ত কিছু বলেনি সে—

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া বার করছি ওর থাম্‌না।

রোষকষায়িত লোচনে জগমোহন বিড়িতে টান দিতে লাগিল।

দুই

বিপিন সমাদ্দার গত বৎসর পূজার সময়ও 'সীতা' সাজিয়াছিল। সম্প্রতি অর্থাৎ বউ আনিবার পর হইতে সে পৌরুষকামী হইয়াছে।

শুনিয়াছি ডাম্বেল-মুদ্গর-সহযোগে পেশীসমূহের উন্নতিবিধান করিতেছে—গোঁফও আর কামায় না। অধিকন্তু কস্‌মেটিক্ সাহায্যে গুম্ফপ্রান্তদ্বয়কে সূচালো করাই বর্ত্তমানে তাহার সাধনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মণিকাঞ্চন-জাতীয় একটা শোভা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়েই সম্ভবতঃ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে জমকালো একজোড়া জুল্‌ফিও সে রাখিয়াছে।

রাখুক!

কিন্তু জগমোহনের যুক্তি ও উক্তি সাধুভাষায় ব্যক্ত করিলে এই দাঁড়ায়—গ্রামের মুখ-রক্ষা করা প্রত্যেক গ্রামবাসীরই কর্ত্তব্য। যে করে না সে শূকর। দেশের এই দুর্দ্দিনে থিয়েটার করিয়া কিছু অর্থ সাহায্যই যদি না করিতে পারা যায় তাহা হইলে আর্ট-চর্চ্চা করার কোন অর্থ হয় না। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্'—ইহা নিতান্ত উজ্‌বুকের কথা। বাজে কথাও।

জগমোহনের মুখে এসব কথা সাজে।

কারণ গ্রামের জন্য জগমোহন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। তাহার গ্রাম-প্রীতি এতই প্রবল যে গ্রামের মাইনর ইস্কুলটা হাই ইস্কুল হইল না বলিয়া সে মাইনর পর্য্যন্ত পড়িয়াই পড়াশুনা খতম করিয়া দিল। তাহারই লেখালেখি ও চেষ্টায় গ্রামে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তাটি হইয়াছে। সে চাঁদা সাধিয়া না বেড়াইলে বারোয়ারি-মণ্ডপটি হইত কিনা সন্দেহ। গ্রামের সমস্ত বিবাহে জগমোহন বাঁধা বরযাত্রী। সে যাইবেই

এবং কন্যাপক্ষের বাড়ীতে গিয়া গ্রাম-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত-জিহ্ব হইয়া থাকিবে। এ লইয়া বহুবার বহুস্থানে সে হাতাহাতি করিয়াছে। একবার নিকটবর্ত্তী শহরে সমাগত এক সার্কাস দেখিতে গিয়া জগমোহনের সার্কাসে ঢুকিবার বাসনা হয়। সুতরাং সার্কাসের একটি ছোকরার সহিত ভাব করিয়া সে সেই আশায় তাহার সহিত একটু মাখামাখি করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই ছোকরা নাক তুলিয়া তাহাকে বলিয়া বসিল—সার্কাসে ঢোকা কি সোজা কথা হে! আমাদের মত শহুরে ছেলেই হিমসিম খেয়ে গেছি। অজ পাড়াগাঁয়ে ত কাটালে এতদিন—মুখের কথা খসালেই অমনি নিয়ে নেবে তোমাকে! এ কি চাট্টিখানি কথা—

জগমোহন ঘৃণায় সেই দিনই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল—ধড় থেকে মুণ্ডুটি তক্ষুনি বাছাধনের নামিয়ে দিতুম যদি না—

বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে সে চুপ করিয়া গেল।

তাহার পর সক্ষোভে বলিল—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া একেবারে মনুষ্যত্বের মূলে গিয়ে কুঠারাঘাত করেছে—বুঝছ না? দাও একটা বিড়ি দাও। দেখি যদি মিত্তির মশাইকে পগিয়ে একটা দরখাস্ত করতে পারি। গ্রামে একটা চেরিটেব্‌ল ডাক্তারখানা নইলে আর চলছে না। কিনে আর কাঁহাতক ওষুধ খাওয়া যায়—

পরদিনই সার্কাসের তাঁবুতে আগুন ধরিয়া গেল।

মিত্র মহাশয়কে দিয়া দরখাস্ত লিখাইয়া, চাঁদা সাধিয়া সে বহু চেষ্টায় ছোটখাট সরকারি ডিস্‌পেন্‌সারিও একটি খাড়া করিয়াছে। চাঁদার

পরিমাণ প্রথমে আশানুরূপ হয় নাই। কিন্তু জগমোহন নিজেই দুইশত টাকা দান করিয়া বসিল। দান করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কিন্তু জমিদারের বাড়ীর একটি ছোট মেয়ের গলা হইতে একটি সোনার হার চুরি হইয়া গেল।

জগমোহন শুনিয়া বলিল—ওদের চুরি যাবে না ত যাবে কার! চাঁদা চাইতে গেলুম কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে! ভগবান বলে একজন আছেন ত!

গ্রামের যাবতীয় কুৎসা সংগ্রহ করা জগমোহনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য! কিন্তু গ্রামের কুৎসা লইয়া গ্রামান্তরের কেহ আলোচনা করুক দেখি! ছলে বলে কৌশলে জগমোহন তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিবেই।

সুতরাং গ্রামে জগমোহনের অনুরাগী একটি দল ছিল।

জগমোহন নিজে থিয়েটার করে না।

কিন্তু থিয়েটারের সে-ই প্রধান পাণ্ডা। ষ্টেজ বাঁধা, চাঁদা তোলা, টিকিট বিক্রী করা, ড্রেস আনানো, রিহার্সালের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক অভিনেতাকে উৎসাহ দেওয়া—সব জগমোহন!

নবাগত ডাক্তারবাবুটিও থিয়েটার-ভক্ত।

তিনিও জগমোহনের বন্ধু ছিলেন।

আমি ত ছিলামই।

তিন

গভীর রাত্রে জগমোহনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

ধড়মড় করিয়া নামিয়া আসিলাম।

যাহা শুনিলাম তাহাতে চক্ষু কপালে উঠিল।

জগমোহন বলিল—শিগ্‌গির চল্‌—বিপ্‌নের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। একটা বিড়ি দে চট্‌ ক'রে।

জগমোহনের সঙ্গে দেখিলাম নিতাই, করালি ও হাবুল রহিয়াছে।

সকলেরই মুখে ভীত চকিত ভাব।

জগমোহন বলিল,—তুই এদের নিয়ে এগো—আমি থানায় চল্লাম।

* * * *

বিপিনের বাড়ী গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

অজ্ঞান বিপিনের গোঁফ ও জুল্‌ফি অন্তর্হিত হইয়াছে।

পরিষ্কার কামানো।

বউ পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে।

গ্রামের প্রান্তে বিপিনের বাড়ী। জগমোহনের বাড়ীর পাশেই। বিপিনের বৃদ্ধ পিতামাতা সম্প্রতি তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। কাছে-পিঠে এক জগমোহন ছাড়া আর কেহ নাই। সুতরাং ডাকাতির সুবিধা আছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ডাকাতে গোঁফ ও জুল্‌ফি ব্যতীত আর কিছুই অপহরণ করে নাই। বিপিনের স্ত্রীর সহিতও তাহারা সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে।

ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ।

গভীর রাত্রে হঠাৎ কয়েকজন মুখোসপরা লোক প্রাচীর টপকাইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং বিপিনকে ডাকিতে থাকে। বিপিন বাহির

হইবামাত্র তাহারা তাহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া ফেলে এবং একটা ঠোঙার মত জিনিসে কি একটা ঔষধ ঢালিয়া শুঁকাইতে থাকে।

বিপিনের স্ত্রীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশী জগমোহন যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় তখন দস্যুগণ বিপিনের গোঁফ ও জুল্‌ফি কামাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

বিবরণ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম!

একটু পরেই স-দারোগা জগমোহন আসিয়া হাজির হইল।

গম্ভীরভাবে সব শুনিয়া দারোগাবাবু কি সব টুকিয়া লইলেন।

তাহার পর হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—অদ্ভুত কাণ্ড! যাক্ আর কোন ভয় নেই।

বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

দারোগাবাবু লোক ভাল।

জগমোহনের বন্ধু। নাট্যামোদী।

যে নাটকটি অভিনয় হইবে তাহাতে তিনিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

জগমোহন আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিল এবং বলিল—দে একটা বিড়ি দে—

চৌধুরী

এক

পূরা নাম কংসারি চৌধুরী।

লোকে সংক্ষেপে বলে চৌধুরী।

বহুকাল পূর্ব্বে কংস চৌধুরীকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই একবার দর্শনের ফলেই মনের মধ্যে যে চিত্রটি আঁকা হইয়া গিয়াছিল তাহা আজও মোছে নাই। মনে হইয়াছিল যেন একটা সিংহ অথবা শার্দ্দূল মানুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছে।

ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মুখখানা।

আরক্ত চক্ষু দুইটি জাজ্বল্যমান।

ভ্রূযুগল-মধ্যে রক্ত সিন্দুরবিন্দু।

একমাথা কোঁকড়ান বাব্‌রি চুল—মাঝখানে সিঁথা।

শক্তিব্যঞ্জক মাংসল ওষ্ঠাধরে স্পর্দ্ধা-ক্রূর নীরব হাস্য।

হাসিলে অথবা কথা কহিলে উগ্র শাদা শ্বাদন্তগুলি চক্‌ চক্‌ করিয়া ওঠে—নাসিকা কম্পিত হইতে থাকে।

ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল।

দুই

একবার মাত্র দেখিয়াছি বটে কিন্তু তাহার কথা শুনিয়াছি অনেক। বস্তুত এই স্বল্পভাষী দুর্দ্ধর্ষ লোকটির সম্বন্ধে নানা কাহিনী না শুনিয়াছেন এমন লোক এ অঞ্চলে বিরল।

সমস্ত কাহিনীরই মূল কথা এক।

চৌধুরীকে কেহ কখনও কোন বিষয়ে হটাইতে পারে নাই।

চৌধুরী গরীবের ঘরে জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু এখন তিনি প্রবল প্রতাপশালী জমিদার।

"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী"—শিরোনামা-সম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাঁহার দরবারে পৌছিতেছে।

দুর্দ্দান্ত কর্ম্মী—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে তিনি অপরাজেয়।

কখনও কাহারও কাছে হার মানেন নাই।

জাল, জুয়াচুরি, ঘুস, খোসামোদ, বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল—কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন যেটার প্রয়োজন কাজে লাগাইয়াছেন।

কিছুতেই চৌধুরী পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন।

দারোগা, উকিল, ডাক্তার, হাকিম সকলেই চৌধুরীর নামে তটস্থ—সকলেই তাঁহার করায়ত্ত।

চৌধুরী মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হাস্য করিয়া বলিতেন—

"জুতো মারব আর কাজ আদায় করে নেব। চামড়ার জুতোয় না কুলোয় চাঁদির জুতো লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে সব!"

এবং সত্যই সব ঠিক হইয়া যাইতেছিল।

চৌধুরী করেন নাই কি?

গ্রামে পিতার নামে স্কুল-স্থাপন, মাতার নামে অবলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা,

বৃন্দাবনে মন্দির, জলসত্র, ডাকাতি, খুন, বড় বড় মামলা, নারী-ধর্ষণ, গৃহদাহ—এমন কি শিশু-হত্যা পর্য্যন্ত।

যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহারই চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

এ দেশে এরূপ অদম্য চরিত্র সত্যই বিস্ময়কর।

একটা গরুর গাড়ী যেন মন্ত্রবলে মোটরের গতি লাভ করিয়া দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সকলেই আমরা আশ্চর্য্য হইতাম।

লোকটা কখনও কোন বিষয়ে হার মানিল না!

হাতীর মুখে লাগাম লাগান যায় না বলিয়া চৌধুরী হাতীই চড়িতেন না!

তিন

হঠাৎ কিন্তু চাকা ঘুরিয়া গেল।

চৌধুরী সহসা অন্ধ হইয়া গেলেন।

অকস্মাৎ!

চতুর্দ্দিক হইতে বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য আসিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন—দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিবে না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন—

‘কিছুতেই না?’

‘না—’

'লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও না ?'

'না—'

একটা প্রেসক্রপ্‌শন লিখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গেলে চৌধুরী তাঁহার বিশ্বাসী দেওয়ানকে বলিলেন—'বল কি হে! পরাধীন হয়ে বাঁচতে হবে? শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হল!'

দেওয়ানজী চুপ করিয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে স্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চৌধুরী আবার বলিলেন—

'আচ্ছা যাও—তুমি ওষুধটা নিয়ে এস—'

দেওয়ানজী চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই ফিরিয়া দেখেন বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

চৌধুরীর রক্তাক্ত দেহটা বিছানায় লুটাইতেছে।

রিভলভার দিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

গুলি করিয়াছেন চোখেই।

ভোম্বলদা

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা।

দেখা হইলেই মুখখানি স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া ওঠে। হাতে এক টিপ্ নস্য লইয়া এবং নাকের আশপাশে নস্য লাগাইয়া ভোম্বলদা সকাল হইতেই রাস্তার মোড়টিতে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং পরিচিত পথিকমাত্রকেই সহাস্যমুখে সম্ভাষণ করেন।

ইহা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য।

—মাতুল যে,—মাছ কত ক'রে কিন্‌লে? গ্র্যাণ্ড মাছ ত! ছ' আনা সের? বল কি!

বাজার দর অবশ্য আট আনা, আমি পেয়েছি ছ' আনাতে। ভোম্বলদা সবিস্ময়ে বলিলেন—ড্যাম চীপ্!

সস্তায় জিনিসপত্র কিনিতে পারেন বলিয়া মাতুলের অহঙ্কার আছে। কেহ সে কথার উল্লেখ করিলে তিনি খুসি হন। মাতুলের কিন্তু দাঁড়াইবার সময় ছিল না—আফিস আছে। তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

—ভূতো যে রে, মাছ কিনেছিস দেখছি—কত ক'রে পেলি? ছ' আনা সের? ড্যাম—

ভোম্বলদার কথা শেষ করিতে না দিয়াই ভূতো সক্ষোভে বলিয়া উঠিল—আর বল কেন ভোম্বলদা! আমাদের মতন লোকের লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়াই উচিত হয়েছে এবার! ছ' আনা সের মাছ? কিনে খেতে পারি আমরা!

ভোম্বলদার চক্ষু কপালে উঠিল।

—ছ' আনা সের! বলিস্ কিরে! গলা কাট্‌ছে বল্!

ভূতো বলিতে লাগিল—

—আধ সের কিনেছি—এই দেখ না—বড় জোর চার-পাঁচ পিস্ হবে! তিনগণ্ডা পয়সা অর্থাৎ টুয়েল্‌ভ্ পাইস্ কিন্তু সাফ্ হয়ে গেল!

—দিনকাল বড় খারাপ পড়ল—সত্যি।

বলিয়া ভোম্বলদা সশব্দে নস্যটা টানিয়া লইয়া নস্যাভিভূত মুখখানাকে যথাসম্ভব চিন্তান্বিত করিবার প্রয়াস পাইলেন!

—এক টিপ্ আমাকে দাও ভোম্বলদা। আমার নাকেই ঢুকিয়ে দাও—দুটো হাতই জোড়া আমার—

—এই যে,—টান্ ভাল করে—

ভোম্বলদা এক টিপ্ নস্য ভূতোর নাসারন্ধ্রে ধরিলেন।

ভূতো যথাসম্ভব টানিয়া চলিয়া গেল।

অদূরে অক্ষয়বাবু দেখা দিলেন।

অক্ষয়বাবু কংগ্রেস-সেবক এবং উগ্র খদ্দরধারী। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির পাণ্ডা এবং সেই সূত্রে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন।

কাছে আসিতেই করতল হইতে নস্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভোম্বলদা সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

—অক্ষয়বাবু, কাল আপনার বক্তৃতাটা সত্যিই চমৎকার হ'য়েছিল—যাকে বলে হৃদয়গ্রাহী। আরে, এ যে গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাবি করিয়েছেন—খদ্দর না কি? দেখি, দেখি—বাঃ—

পাঞ্জাবির কাপড়টা হাতে দিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ভোম্বলদা বলিলেন—বাঃ এ যে প্রায় সার্জ্জের মতন। চমৎকার জিনিস ত!

চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া মোটা গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করার মত ধরণে অক্ষয়বাবু বলিলেন—সার্জ্জই হোক আর চট্ই হোক—খদ্দরই এখন আমাদের একমাত্র গতি—উপায় নেই এ ছাড়া—

বলিয়া চক্ষু দুইটি হঠাৎ ছোট করিলেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব কায়দা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদা বলিলেন—সে কথা আবার বলতে! দেশের জন্যে আপনারা যে প্রাণপাত করছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দেশের বুকে। স্যাক্রিফাইস্ না হ'লে কিছু হয়? খদ্দরটা কিন্তু বেশ চমৎকার। থাপির ওপর বেশ ইয়ে—কত করে গজ?

দেড় টাকা বোধ হয়। ঠিক মনে নেই—

দামও ত এমন কিছু বেশী নয়—বাঃ।

ছাড়, একবার নিবারণ ঘোষালের ওখানে যেতে হবে। লোকটা শুন্ছি অ্যান্টি-কংগ্রেস প্রোপাগ্যাণ্ডা করছে!

ভোম্বলদা পাঞ্জাবির কাপড়টা দেখিতেছিলেন—ছাড়িয়া দিলেন।

দেখা দিলেন দয়াময় খুড়ো। খুড়ো রাস্তার ওপাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ভোম্বলদা হাঁকিলেন—খুড়ো, পাশ কাটাচ্ছ যে! খবর সব ভালো ত?

খর্ব্বকায় বালাপোষ-আবৃত খুড়ো রাস্তাটা পার হইয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—খবর আর কি! সূর্য্য চন্দ্র এখনও উঠছে ভালোর মধ্যে এই। সারা বাজারটা ঢুঁড়ে বিলিতি গরম মোজা একজোড়া পেলাম না হে।

তাই না কি?

হ্যাঁ হে! আগে সেই যে সাদা—একটু হল্‌দেটে গোছের একরকম মোজা আসত। এক জোড়া কিনলেই নিশ্চিন্দি! প'রেও আরাম—টেঁকেও অসম্ভব। গত বছরের আগের বছর কিনেছিলাম এক জোড়া। ঠেসে-মেড়ে দুটি বছর পায় দিয়েছি। এ বছর কিন্তু আর পাচ্ছি না। ঐ যে মোড়ে এক ভেঁপো ছোকরা কাটাকাপড়ের দোকান করেছে—সে ত লম্বা এক লেক্‌চারই ঝেড়ে দিলে—বিলিতি কেনা উচিত নয়। উচিত নয় সে কি আমাকে শেখাবি তুই? কিন্তু ওরকম মোজা বার করুক দিকি দিশি—দেখাক্ দিকি আমাকে!

বলিয়া রোগা দয়াময় খুড়ো সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দক্ষিণ হস্তটি চক্রাকার নাড়িয়া দিলেন।

ভোম্বলদা সহাস্যমুখে কিছুক্ষণ দয়াময় খুড়োর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কৌটা হইতে এক টিপ্ নস্য লইতে লইতে চাপা-কণ্ঠে চুপি চুপি বলিলেন—এসব কথা চেঁচিয়ে বলতে নেই আজকাল খুড়ো—এইমাত্র অক্ষয়বাবু গেলেন! বিলিতি জিনিসের তুলনা আছে? যাকে বলে মার নেই! কাকে বলি বলুন! আজকাল অক্ষয়বাবুদের পোয়া বারো—। দিনকাল যা পড়ল ভালো জিনিস মেলাই দুর্ঘট!

ভোম্বলদা এমন একটা মুখভাব করিলেন যেন মনের গোপন কথাটি দয়াময় খুড়োর নিকট ব্যক্ত করিতে পারিয়া তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

খুড়ো বলিলেন—ঐ যে বললাম—আজকাল ভালোর মধ্যে এই যে চন্দ্র সূর্য্য এখনও উঠছে! যাই দেখি, মাড়োয়ারিদের দোকানগুলো খুঁজি একবার। থাকলে ঐ ব্যাটাদেরই ওখানে থাকবে। শীতও বেজায় পড়েছে হে! চাক্‌রির কিছু হ'ল?

ক'ই আর কিছু হ'ল!

খুড়ো গেলেন।

আসিল ফণী।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয় একটি বালক—স্থানীয় স্কুলে পড়ে।

তাহার সহিতও ভোম্বলদা ফুটবল খেলা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন—তাহাকেও এক টিপ্ নস্য দিলেন। তাহাদের স্কুলের টীম সেদিন ম্যাচে ছয় গোলে হারিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ যে রেফারির পক্ষ-পাতিত্ব সে বিষয়েও তাহার সহিত একমত হইলেন।

ফণী চলিয়া গেলে আসিলেন টেকো ভটচায্।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আধুনিক ছেলেছোকরাদের নিন্দাবাদে সর্ব্বদাই শতমুখ। তিনি আসিয়াই আধুনিক ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচার প্রসঙ্গ তুলিলেন এবং ভোম্বলদার আন্তরিক অনুমোদন পাইলেন। একটু পরেই অতি-আধুনিক ছোকরা বিমল আসিল এবং ধর্ম্মই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় এবং সস্তার মধ্যে মুর্গীর ডিমই যে নির্ভেজাল শ্রেষ্ঠ খাদ্য ইহা লইয়া আলোচনা করিল এবং সে-ও ভোম্বলদার সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিয়া শিস্ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

এইরূপে অনেকেই আসিল এবং গেল।

নস্যের টিপ্ হাতে ভোম্বলদা সারা সকালটা মোড়ে দাঁড়াইয়া সকলের সহিত সকল বিষয়েই একমত হইলেন।

ভোম্বলদার মনটি যেন জলবৎ—যখন যে পাত্রে রাখা যায় তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার চাকুরিটি গিয়াছে। অফিসে বড়বাবুর কাছে ছোটবাবুর সম্বন্ধে এবং

ছোটবাবুর কাছে বড়বাবুর সম্বন্ধে এমন সব কথা সারল্যভরে ভোম্বলদা ফাঁস করিয়া ফেলেন যে উভয়েই তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া যান—ফলে চাকুরিটি যায়।

ভোম্বলদা সকলেরই মন রাখিয়া কথা বলেন—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কখনও কাহারও মন পান না। সকলেরই সকল কথায় সায় দেন—কিন্তু কেহই যেন তাঁহাকে আমল দেয় না। এমন কি, নিজের গৃহিণীও নয়। বাড়ীতে সকলের সকল প্রকার আচরণের সহিত সায় দিতে গিয়া এবং পরস্পর-বিরোধী কথা বলিয়া ফেলিয়া ভোম্বলদা গৃহিণীর নিকট প্রায় প্রত্যহই বকুনি খান এবং অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে ইহা লইয়া এত অশান্তির সৃষ্টি হয় যে ভোম্বলদা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

তখন ভোম্বলদার মুখখানি দেখিলে সত্যই বড় কষ্ট হয়।

তাঁহার তরল মনটি কিছুতেই যেন কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না।

অসহায় বিপন্ন মুখচ্ছবি!

দূরে গঙ্গার ওপারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

সরল গোলগাল মুখখানি বিমর্ষ।

হাসি নাই।

মানুষ

অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম।

গঙ্গা-বক্ষে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্তে বর্ণনাতীত বর্ণ-সমারোহ। নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপ্ন-সায়রে নিমগ্ন। শাদা পাল তুলিয়া কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে। ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান মাছ-রাঙা পাখীগুলি সন্ধ্যারুণরাগ-রঞ্জিত। টলমল নদী জল আরক্ত স্বর্ণবর্ণ।

প্রতি তরঙ্গশীর্ষে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শোভা।

তৃণাঙ্কিত শ্যামল তীরে দেবালয়।

দেবালয়ের সম্মুখে রোমন্থনরত নধর-দেহ একটি গাভী।

আরও একটু দূরে মুদিত নয়ন একটি মার্জ্জার।

দেবালয়ে করুণ গম্ভীর সুরে নহবৎ বাজিতেছে!

পূরবীর অপরূপ আলাপ।

চতুর্দ্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

নদীর তীরে ঘাসের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম।

ভাবিতেছিলাম—কি সুন্দর এই পৃথিবী।

* * * *

সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

আমার পিছনে কে যেন জড়িত কণ্ঠে কথা কহিল।

ফিরিয়া দেখি একটি ভিখারী এবং তাহার সহিত একটি মেয়ে।

ভিখারী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

হস্তপদ অঙ্গুলিহীন।

নাসিকার স্থানে একটি গহ্বর।

বিকৃত বীভৎস মুখখানায় মিনতি ফুটাইয়া অনুনাসিককণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে।

একটি পয়সা বাবু—

সঙ্গের মেয়েটিও সে কথা পুনরাবৃত্তি করিল।

মেয়েটির বয়স ষোল সতেরো—

শরীরে কোন ব্যাধি আছে বলে মনে হইল না।

পরণে একটি মাত্র বসন—শতছিন্ন।

বসনের শত ছিন্নপথ দিয়া নবমুকুলিত যৌবন উপচাইয়া পড়িতেছে।

দারিদ্র্যের মলিনতায় তাহা লাঞ্ছিত।

তবু তাহা যৌবনশ্রী।

মেয়েটিও সে সম্বন্ধে সচেতন।

তাহার মুখ-চোখ ভাব-ভঙ্গী ইঙ্গিতময়।

এরূপ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক ও যুবতী ভিখারিণী ইতিপূর্ব্বে আরও দেখিয়াছি।

কিন্তু আজ সহসা তাহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম।

ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে—একই উদ্দেশ্যে।

ক্ষুধার অন্ন চাই।

ভিক্ষা ইহাদের ব্যবসায়।

সেই ব্যবসায়ে একজন মূলধন করিয়াছে ব্যাধিটাকে—আর একজন যৌবনকে।

দুইজনকেই দুইটি পয়সা দিলাম।

চলিয়া গেল।

কুষ্ঠরোগী লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে।

মেয়েটির গতি সাবলীল। কিছুদূর গিয়া সে আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল।

মুখে মুচ্‌কি হাসি।

নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

তাহার ছিন্ন বসনের শতরন্ধ্র চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

* * * *

সহসা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার।

সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—বিড়ালটা একটি ইঁদুর ধরিয়াছে।

ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল।

গাভীটিও হাম্বারব তুলিল।

দেখিলাম দুধ দোহা হইতেছে। একজন দোহন করিতেছে এবং আর একজন মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে প্রাণ-পণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।

তাহার করুণ কাকুতি সন্ধ্যার শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে লাগিল।

* * * *

আকাশে কৃষ্ণ-পক্ষ মেলিয়া সারি সারি বাদুড়ের দল উড়িয়া চলিয়াছে। পালতোলা নৌকাগুলি দেখিলাম জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া দেখিলাম।

আলোক সমারোহ আর নাই।

অস্তমিত রবির বর্ণ-সমারোহ চক্রবালরেখায় ম্রিয়মাণ।

অন্ধকার নামিতেছে।

উঠিয়া পড়িলাম।

পথে দেখিলাম সেই উদ্ভিন্নযৌবনা ভিখারিণী একটা গলির স্বল্প আলোকে দাঁড়াইয়া একটি গুণ্ডাগোছের লোকের সহিত হাস্য পরিহাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম পাশের বাড়ীর বধূটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। আনন্দ-শঙ্খধ্বনি সে শুভবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। সন্ত-পুত্রশোকাতুরা আমার গৃহিণী সজল চক্ষে প্রার্থনা করিতেছেন—ভগবান বাঁচাইয়া রাখ।

অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজগুলা উল্টাইতে লাগিলাম।

বহুবাধাসত্ত্বেও একটি সতী স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে।

—বহুবিফলতাসত্ত্বেও আর একদল দুঃসাহসী এভারেস্ট্ অভিযানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন।

চীন-জাপান-যুদ্ধ।

স্পেন।

বাঙালীর দুর্গতি ও তাহার নানা প্রকাশ।

কংগ্রেস—

1 P8

দুয়ারে কড়া নড়িয়া উঠিল।

পিওন তার আনিয়াছে। সুসংবাদ। আমার অকর্ম্মণ্য ভাইটির চাকুরি হইয়াছে। এই চাকুরিটির জন্য পাঁচশত প্রার্থী ছিল।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটির অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠও ছিল। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সুপারিশের জোরে আমার ভাই-ই চাকুরিটি পাইয়াছে।

এতবড় অবিচারে এতটুকু বিচলিত হইলাম না।

উপরন্তু খুসী হইলাম।

ছাদে উঠিলাম।

কালো মেঘের স্তর-ভেদ করিয়া অপরূপ শোভায় চাঁদ উঠিতেছে।

পূর্ব্ব দিগন্ত জ্যোৎস্না-পুলকিত।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

আনন্দটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার জন্য একটি সিগারেট ধরানো প্রয়োজন।

পকেটে হাত দিয়া দেখি—সিগারেট কেস খালি।

সিগারেট আনিতে ভুলিয়াছি।

আবার মনটা বিগড়াইয়া গেল।

উদীয়মান চন্দ্রকে আকাশে রাখিয়া সিগারেট কিনিবার জন্য আমি আবার দ্রুতগতিতে গলিতে নামিয়া গেলাম।